এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান

ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

।। উৎসর্জন ।।

'শায়খুল হাদীস'
হযরত মাওলানা যাকারিয়া
রহিমাহুল্লাহ

মাহে রমযান এলেই যিনি হয়ে যেতেন
এক 'অন্য মানুষ'!

চারিদিকে গুঞ্জরিত হতো একটাই ধ্বনি
'শায়খের এখন রমযান মাস'!

সূচিপত্র

ভূমিকা

কেন পড়বেন 'এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান'

প্রিয় পাঠক, নিশ্চিত করেই আপনার যাপিত জীবনে অনেকগুলো রমযান মাস গত হয়েছে। সামনে দরজায় কড়া নাড়ছে আরেকটি 'মাহে রমযান'। মুমিন বান্দার জীবনে তো মাহে রমযান আগমন করে পুষ্পিত বসন্তের সুবাসিত ফল্গুধারা নিয়ে, রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে এবং অসামান্য অর্জন ও প্রাপ্তির সুযোগ নিয়ে।

কিন্তু...।

কিন্তু কেবল যথার্থ প্রস্তুতির অভাবে অনেক সময় মাহে রমযানের প্রথম দিকের দিনগুলো অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। যথাযথ প্রস্তুতি না থাকায় আমাদের মাঝে থাকে না রোযার গুরুত্ব-অনুভব, তেলাওয়াতে কোরআনের অনির্বচনীয় স্বাদ এবং কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ নামাযে বিনম্রতার অনুভূতি। অথচ মহিমান্বিত এ মাসের প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি ভগ্নাংশ মুমিন বান্দার জীবনে অমূল্য সম্পদ। সচেতন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য—বরকত, রহমত ও মাগফিরাতের ফল্গুধারায় সিক্ত এ মাসে আমলের বিষয়ে সামান্য শিথিলতা না করা।

সাধারণ একজন ক্রীড়াবিদের কথাই চিন্তা করুন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে তার কী পরিমাণ পরিশ্রম ও সাধনা! কী কঠোর প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন! কারণ, সে বিশ্বাস করে– মূল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চাইলে এবং খেলাধুলার ময়দানে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে চাইলে পূর্বপ্রস্তুতির কোন বিকল্প নেই। (অথচ বিশ্বাসী মুসলমান

হিসেবে আমি-আপনি সকলেই জানি, ক্রীড়াবিদের খেলাধুলা পার্থিব জীবনে হয়তো সামান্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে; কিন্তু পরকালে ধুলোমলিন হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়!)

তাহলে একজন মুসলমান যদি যথার্থ প্রস্তুতি ও নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন ছাড়াই অবতীর্ণ হয় রমযানের ময়দানে, সে কীভাবে পারবে রমযানের মহা মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে? সময়ের প্রতিটি ভগ্নাংশকে অর্জনের মাধ্যম বানাতে?

এ কারণেই আলেম-ওলামা, দাঈ ও খতীবগণসহ উম্মাহর পথপ্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠতম কাফেলার সদস্যগণ রমযান মাসে নিজেদের আমলের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শাবান মাস হতেই আমলের বিশেষ ধারা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। শাবানে তারা বেশি বেশি রোযা রাখেন, বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করেন, রাতের অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ ও দোয়া-রোনাযারিতে কাটিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তাদের এই কর্মধারা প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য।

অবশ্য আমার মনে হয়, আমলী এই প্রস্তুতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে আমরা অবচেতন মনে উপেক্ষা করছি। আর তা হচ্ছে রমযানের 'মানসিক প্রস্তুতি'। মানসিক প্রস্তুতি বলতে আমি বুঝিয়েছি– অধীর আগ্রহে এ মাসের প্রতীক্ষায় থাকা, বরকতে টইটম্বুর দিবস-রজনীগুলোর প্রত্যাশায় বাকি থাকা প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা গুনতে থাকা; আর কত দিন! কত ঘণ্টা! কত মিনিট! কত সেকেন্ড! মনে দুরু দুরু আশঙ্কা—না জানি 'আজাল'[১] এর ডাক এসে যায়! কপালে না জোটে রমযান-সান্নিধ্য!

---

[১] আজাল মানে মৃত্যুর সুনির্ধারিত সময়। ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাই প্রদান করে যে, মানবজীবনের হায়াত ও মউত, আগমন ও প্রস্থান প্রতিটি বিষয় আল্লাহ তাআলার ইলমে সুনির্ধারিত। আল্লাহ-নির্ধারিত সেই সময় যখন এসে যায়, তখনই আসে মৃত্যু, শুরু হয় মৃত্যুপরবর্তী জীবন। মানুষের জীবনে 'অকাল' মৃত্যু বলে কিছু নেই; আছে শুধু 'আজাল'!

এ ধরনের আবেগ-অনুভূতি অর্জন করা সত্যিই অনেক কঠিন। বড় ভাগ্যবান তারা, যারা এর অধিকারী হয়েছেন! রমযানের পূর্বেই তারা লাভ করেন মাহে রমযানের হাকীকী লাযযাত ও প্রকৃত স্বাদ-অনুভব! কেবল অনুভবের আনন্দ নয়; তারাই পারেন মাহে রমযানের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে, রমযানকে প্রাপ্তি ও অর্জনের মাধ্যম বানাতে।

তবে প্রিয় পাঠক! আমি ভেবে দেখেছি যে, এই পরম দুর্লভ মানসিক অনুভূতি অর্জনের পথ একেবারে সহজ! একান্ত মনে ভাবতে শিখুন, আগত রমযানই এই নশ্বর ধরণীতে আপনার জীবনের শেষ রমযান! তারপর দেখুন, কী প্রবল বাসনা রমযান প্রাপ্তির! কী অবিরাম প্রচেষ্টা একেকটি মুহূর্তকে সদ্ব্যবহারের!

কীভাবে শিখবেন এই ভাবনা? কীভাবে অর্জন করবেন এই আবেগ-অনুভূতি?

তা জানতেই তো আপনি হাতে তুলে নিয়েছেন 'এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান'!

তাহলে আসুন, শুরু করি বিসমিল্লাহ বলে!

— ড. রাগিব সারজানি

মৃত্যু বুঝি অনেক দূরে!
'আজাল' তো কত কাছে!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে বলেছেন। নবীজী ইরশাদ করেছেন,

«أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ»

তোমরা স্বাদবিনষ্টকারী (মৃত্যু)-কে বেশি বেশি স্মরণ করো।[২]

অবশ্য মৃত্যুকে স্মরণ করার বিশেষ কোন ওযিফা ও পরিমাণ নবীজী বাতলে দেননি। প্রতিদিন একবার, না-কি তিনবার; সপ্তাহে কতদিন— নবীজী তা নির্দিষ্ট করেননি। বিষয়টি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন উম্মাতের বিবেচনার উপর। ঈমানী শক্তির মাত্রা-ভিন্নতায় মৃত্যুর স্মরণও কম-বেশি হয়ে থাকে। অনেকের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় কাউকে মারা যেতে দেখলে, মৃত্যুশয্যায় কাউকে ছটফট করতে দেখলে কিংবা মৃত্যুসংক্রান্ত ওয়ায-নসীহত, বক্তৃতা-আলোচনা পড়লে বা শুনলে। অন্য সময় মনে থাকে না এবং মনে পড়ে না যে, আমারও একদিন ডাক আসবে।

সালাফ কিন্তু এমন ছিলেন না। উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম কাফেলার বিশিষ্ট সদস্য হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি.-এর মৃত্যু-দর্শন দেখুন! তিনি বলতেন,

«إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ»

'সন্ধ্যায় উপনীত হলে আগামী সকালের অপেক্ষা কর না। আর সকালে উপনীত হলে আশায় থেকো না পরবর্তী সন্ধ্যার।'[৩]

হৃদয় তোলপাড় করা এই অমর উক্তিটি তিনি করেছিলেন প্রিয় নবীজীর নিম্নোক্ত হাদীসের মর্মার্থ ব্যাখ্যায়—

---

[২] *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২৩০৭, *সুনানে নাসায়ী*, হাদীস নং ১৮২৪, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৪২৫৮।

[৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪১৬ এর অধীনে।

«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ»

দুনিয়াতে বসবাস করো একজন আগন্তুকের ন্যায় কিংবা একজন পথিকের ন্যায়।[৪]

অবশ্য প্রিয় নবীজীর এক হাদীসে প্রতি দু'দিনে একবার মৃত্যুর কথা স্মরণের প্রতি ইঙ্গিত-নির্দেশ পাওয়া যায়। নবীজী ইরশাদ করেছেন,

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَه شَيْءٌ يُوصِيْ فِيْهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُه مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَه»

ওসিয়তযোগ্য কিছু সম্পদের মালিক থাকা অবস্থায় কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত লিপিবদ্ধ করা ব্যতিরেকে একটানা দু' রাত অতিবাহিত করা উচিত নয়।[৫]

এ ছাড়াও মুসলমান যেন সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখে, এজন্য রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একটি আপেক্ষিক বিশ্লেষণও তুলে ধরেছেন এবং তার মাধ্যমে মানুষের দীর্ঘ জীবনের আশা, লালসা ও প্রত্যাশার বিচিত্রতা এবং আল্লাহ কর্তৃক বান্দার জন্য নির্ধারিত জীবনকালের মাঝে তুলনা তুলে ধরেছেন। হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, একদিন নবীজী কয়েকটি রেখা টানলেন এবং ইরশাদ করলেন, এটা (মানুষের) আশা আর এটা তার নির্ধারিত আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থায় থাকে, হঠাৎ নিকটবর্তী রেখাটি (অর্থাৎ মৃত্যু) এসে যায়।[৬]

মানুষ নানা স্বপ্ন দেখে, পরিকল্পনার জাল বোনে। এটাই হলো মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে বিদ্যমান আশার দীর্ঘতা। অবশ্য এটা নিন্দনীয়ও নয়। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেছেন,

---

[৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪১৬।
[৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৭৩৮ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৬২৭।
[৬] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪১৮।

«الشَّيْخُ يَكْبَرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُه، وَقَلْبُه شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ : طُوْلِ الْعُمُرِ وَالْمَالِ»

মানুষ বৃদ্ধ হতে থাকে এবং তার দেহ (অস্থি-মজ্জা) দুর্বল হতে থাকে। কিন্তু দু'টি জিনিসের মোহে তার হৃদয় যেন তরুণ হতে থাকে—দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের মোহ।[৭]

কিন্তু স্বপ্ন ও পরিকল্পনার এই দীর্ঘতার পাশাপাশি মানুষের কর্তব্য হলো অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে থাকা এবং বেশি বেশি নেক আমল করা। মানুষ জানুক বা না জানুক, অনুভব করুক বা না করুক, মালাকুল মাওত আযরাঈল আ.-কে দেখুক বা না দেখুক, মৃত্যু তো এক অনিবার্য সত্য! মৃত্যু তো হাত-ছোঁয়া দূরত্বে! কেউ যদি অবস্থান করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ঘেরাটোপে, দুর্ভেদ্যতম প্রাসাদ-অভ্যন্তরে, বাঁচতে কি পারবে হিমশীতল মৃত্যুর স্পর্শ থেকে?! মৃত্যু তো সেখানেও তাকে ছুঁয়ে যাবে! আল কোরআনের ভাষায়—

﴿أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

তোমরা যেখানেই থাকো, (সময়মতো) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা সুরক্ষিত কোন দুর্গেই থাকো না কেন। [সূরা নিসা : ৭৮]

প্রসিদ্ধ আরবী কবি কা'ব বিন যুহাইর বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ أُنْثَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُه   يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُوْلُ

প্রতিটি মায়ের সন্তান যতই নিরাপদে থাকুক, তার জীবনে সেদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন তাকে বহন করা হবে শবাধারে।[৮]

আরেক কবি আবুল আতাহিয়াহ বলেছেন,

نَسِيْتُ الْمَوْتَ فِيْمَا قَدْ نَسِيْتُ   كَأَنِّيْ لَا أَرَى أَحَدًا يَمُوْتُ

---

[৭] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৮৪২২।
[৮] *দিওয়ানে কা'ব বিন যুহাইর*, পৃষ্ঠা : ১৩২।

أَلَيْسَ الْمَوْتُ غَايَةَ كُلِّ حَيٍّ　　فَمَا لِيْ لَا أُبَادِرُ مَا يَفُوْتُ

বিস্মৃত বস্তুর কাতারে আমি মরণকেও যোগ করেছি, ভুলে গেছি মৃত্যুকেও; যেন আমি কখনো কাউকে দেখিনি মারা যেতে!

মৃত্যুই কি প্রতিটি জীবনের চূড়ান্ত কথা নয়? তাহলে কি হলো আমার! সময় চলে যাচ্ছে অথচ নেই কোন তাগাদা, নেই ব্যাকুলতা-অস্থিরতা! [৯]

আরব কবিদ্বয়ের কথা রাখুন। তাদেরও পূর্বে মুহাম্মাদী কাফেলার শ্রেষ্ঠতম সদস্য সাইয়েদুনা আবু বকর রাযি. মৃত্যুর হাকীকত ও স্বরূপ আরও গভীররূপে তুলে ধরেছেন। আবু বকর রাযি. বলতেন,

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِه　　وَالْمَوْتُ أَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه

প্রতিটি মানুষ (হাসি-আনন্দে) দিন কাটাচ্ছে পরিজনের সঙ্গে! অথচ মৃত্যু তো তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে![১০]

এ কারণেই বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং মৃত্যুর স্মরণ সর্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ও পরবর্তী প্রত্যেক যুগের বুযুর্গদের রীতি ছিল।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু দারদা রাযি. বলেন, 'তিন ব্যক্তির আচরণ আমায় অবাক করে—১. যে দুনিয়ার চিন্তায় নিমগ্ন; অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে ফিরছে। ২. জীবন নিয়ে যে উদাসীন; অথচ তার হিসাব-নিকাশ উদাসীনতার শিকার নয়। ৩. যে প্রাণখুলে হাসছে; অথচ তার জানা নেই যে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করছে, না অসন্তুষ্ট।'[১১]

আবু দারদা রাযি. আপন অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মানুষ দুনিয়ায় ডুবে আছে। তারা দুনিয়ার অন্বেষণে ছুটে বেড়াচ্ছে;

---

[৯] *দিওয়ানে আবুল আ'তাহিয়াহ*, পৃষ্ঠা : ৭২।
[১০] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৮৮৯।
[১১] ইবনুল মুবারক, *কিতাবুয যুহদ*, পৃষ্ঠা : ৮৪।

অথচ তাদের অনুভূতিই নেই যে, মৃত্যু তাদের পেছনে ছুটছে এবং যে কোন মুহূর্তে প্রাণ কেড়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে।

আরেক প্রবীণ সাহাবী আবু যর রাযি. বলতেন, 'তোমরা কি আমার নিঃস্ব হওয়ার দিনের কথা জান? তা তো সেই দিন, যেদিন আমাকে সমাধিস্থ করা হবে!'[১২]

কে বলছেন এই কথা?! সেই মহান সাহাবী, যিনি তাবুকের অভিযানে পথচলার সময় তার বাহনজন্তু ধীরে চলছিল বলে বাহনজন্তু ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলতে থাকেন এবং কয়েক শ মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন! নববী সংস্পর্শে ধন্য সেই দুনিয়াবিরাগী আবিদ সাহাবী যদি মৃত্যুর দিনকে অভিহিত করেন নিঃস্বতার দিন বলে, তাহলে আমাদের মতো উদাসীনদের মৃত্যুর দিনটি কেমন হবে?!

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. জানাযার খাটিয়া যেতে দেখলে মৃতদেহকে সম্বোধন করে বলতেন, 'যাও, আমরাও তোমার অনুগমন করছি!'[১৩]

আবু হোরায়রা রাযি. তাদের মতো ছিলেন না, যারা জানাযার সঙ্গে পথ চলে; অথচ মন-মস্তিষ্ক জুড়ে থাকে পার্থিব নানা চিন্তা-পরিকল্পনা; জানাযা শেষ করেই তা বাস্তবায়ন করার চিন্তা। বরং জানাযার খাটিয়া দেখার পর তার হৃদয়ে এই অলজ্ঘনীয় বাস্তবতাই বিরাজ করত যে, আমরা সকলেই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য পানে ছুটে চলছি। ছুটে চলছি রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হতে।

সাহাবা-পরবর্তী যুগের বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন, 'মৃত্যু পৃথিবীকে লাঞ্ছিত করে বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছে এবং জ্ঞানীদের জন্য দুনিয়াতে কোন আনন্দ বাকি রাখেনি।'[১৪]

এ কারণেই হাসান বসরী রহ. জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন অস্থির চিত্তে, ব্যথিত হৃদয়ে। কাল কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের ফয়সালা এবং প্রিয়

---

[১২] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ৪/৪৮৬।
[১৩] প্রাগুক্ত, ৪/৪৮৪।
[১৪] প্রাগুক্ত, ৪/৪৫১।

নবীজীর সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ ব্যতীত তার কাছে আনন্দের ভিন্ন কোন মর্মার্থ ছিল না।

বিখ্যাত তাবেয়ী মাকহূল রহ. জানাযা যেতে দেখলে বলতেন, 'যাও, আমরাও আসছি। মৃত্যু সুস্পষ্ট এক উপদেশ; কিন্তু উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে।'[১৫]

রবি' বিন খাইছাম রহ.-ও এভাবেই জীবন কাটাতেন। মৃত্যুকে তিনি মনে করতেন শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। তিনি বলতেন, 'মুমিন যদি কোন কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে, তবে মৃত্যুর চেয়ে উত্তম তার জন্য কোন কিছু নেই।' তিনি আরও বলতেন, 'আমি মারা গেলে কাউকে অবগত করো না; আমাকে নিয়ে চলো আমার রবের কাছে।'[১৬]

নিজেকে তিনি সর্বদা মৃত্যুর সফরের জন্য প্রস্তুত রাখতেন। মৃত্যুর স্মরণ যেন কখনই স্মৃতিপট থেকে বিস্মৃত না হয়ে যায়, এজন্য তিনি অভিনব এক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ঘরের অভ্যন্তরে তিনি একটি কবর খনন করেছিলেন। মৃত্যুকে স্মরণ করতে প্রতিদিন তিনি সেখানেই ঘুমাতেন। তিনি বলতেন, 'মৃত্যুর স্মরণ যদি এক মুহূর্তের জন্যও আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে যায়, তাহলে অন্তরের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'[১৭]

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি' রহ.-কে যদি জিজ্ঞেস করা হতো, 'আজকের সকাল কেমন কাটল?' তিনি উত্তর দিতেন, 'এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়, প্রতিদিন যে আখিরাতের পথে এক-একটি ঘাঁটি পাড়ি দিচ্ছে?!'[১৮]

তিনি এবং 'তারা' এভাবেই মৃত্যুকে স্মরণ করতেন এবং এভাবেই এই চিরসত্যকে উপলব্ধি করতেন যে, প্রতিদিন বরং প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ধীরে

---

[১৫] প্রাগুক্ত, ৪/৪৮৪।

[১৬] আহমাদ বিন হাম্বল, *কিতাবুয যুহদ*, পৃষ্ঠা : ২৭৪ ও আবু হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪৫১।

[১৭] ইবনে আবিদ দুনইয়া, *আল আ'যলাতু ওয়াল ইনফিরাদ*, পৃষ্ঠা : ৫৮ ও আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ৪/৪৫১।

[১৮] আবু নুআইম আসবাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া*, ২/৩৪৮ ও আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ২/২৩০।

ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে। এরূপ হয় যাদের বোধ ও উপলব্ধি, বলুন, কেমন হওয়ার কথা তাদের জীবন? নিশ্চয়ই বলবেন, নেক আমল আর শরীয়তের আনুগত্যের প্রচেষ্টায়ই কাটে তাদের জীবন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও উল্লেখ করা যেতে পারে খোলাফায়ে রাশেদীনের মহান সদস্য খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয রহ.-এর কথা। তিনি প্রতি রাতে বিশিষ্ট ফকীহগণকে সমবেত করতেন আর সকলে মিলে আলোচনা করতেন মৃত্যুর কথা, কিয়ামতের কথা এবং পরকালের কথা। এরপর সকলে এমনভাবে কাঁদতেন, যেন তাদের সামনে কোন লাশ রাখা আছে।[১৯]

কোন মানুষ যদি জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী হয়, মৃত্যুর চিন্তা ও মৃত্যুর আগমনের চিন্তা জাগরূক থাকে তার সত্তাজুড়ে, তাহলে প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনা তার অন্তরে সৃষ্টি করে প্রকম্পন। হযরত আ'মাশ রহ. বলতেন, 'আমরা জানাযায় উপস্থিত হতাম; কিন্তু বুঝতাম না, কাকে সান্ত্বনা দেব। কেননা, বেদনা ও দুঃখ উপস্থিত সকলকেই ভারাক্রান্ত করে রাখত।'[২০]

হযরত ছাবিত বুনানী রহ. বলতেন, 'আমরা জানাযায় উপস্থিত হলে সবাইকেই দেখতাম মুখ ঢেকে ক্রন্দন করতে।'[২১]

এ কারণেই প্রত্যেক যুগের বুযুর্গগণ মুসলমানদেরকে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উপদেশ দিতেন। আব্বাস বিন হামযা রহ. বলেন, একদিন আমি যুননুন মিসরীর দরবারে উপস্থিত হলাম। তার সামনে তখন তার মুরীদগণও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের বলছিলেন, 'ঘুমাতে গেলে মৃত্যুকে বালিশ বানাবে। জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যুকে মূল চিন্তার বিষয় বানাবে। এমন হয়ে যাও, যেন দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই; তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন আখিরাত।'[২২]

---

[১৯] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ৪/৪৫১।
[২০] প্রাগুক্ত, ২/২১০, ৪/৪৮৪।
[২১] প্রাগুক্ত, ৪/৪৮৪।
[২২] বাইহাকী, *আযযুহদুল কাবীর*, পৃষ্ঠা : ২৬১।

রবি' বিন খাইছাম রহ. বলতেন, 'মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যার স্বাদ তোমরা ইতঃপূর্বে আস্বাদন করনি।'[২৩]

আ'ওন বিন আবদুল্লাহ রহ. বলতেন, 'আজকের দিনকে স্বাগত জানিয়েছে, এমন কত মানুষ আজকের দিনটি পূর্ণ করতে পারবে না! আগামীকালের প্রতীক্ষারত কত মানুষ আগামীকালের নাগাল পাবে না! তোমরা যদি মৃত্যুকাল ও মৃত্যুর আগমনপথে তাকিয়ে থাকতে, তাহলে আশা ও প্রত্যাশার প্রবঞ্চনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে।'[২৪]

হযরত আবু আবদু রাব্বিহী একদিন মাকহূল রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু আবদুল্লাহ! তুমি কি জান্নাত পছন্দ কর?' মাকহূল রহ. উত্তর দিলেন, 'জান্নাত কে পছন্দ না করে?!' 'তাহলে মৃত্যুকে ভালোবাসতে শেখ।' আবু আবদি রাব্বিহীর উত্তর। 'কেননা, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তুমি কিছুতেই জান্নাতের সাক্ষাৎ পাবে না।'[২৫]

মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও আকাবির বুযুর্গগণ আমাদেরকে অবগত করেছেন। রাজা বিন হাইওয়া রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে, সে হিংসা ও আনন্দ ছেড়ে দেয়।'[২৬]

বিশর বিন হারিস রহ. বলেন, 'মৃত্যুকে স্মরণ করলে তোমার অন্তর থেকে পার্থিব আনন্দ ও প্রবৃত্তির বাসনা দূর হয়ে যাবে।'[২৭]

ইবরাহীম তাইমী রহ. বলেন, 'দু'টি বস্তু আমার অন্তর থেকে দুনিয়ার স্বাদ দূর করে দিয়েছে—মৃত্যুর স্মরণ ও আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার চিন্তা।'[২৮]

---

[২৩] আবু নুআইম আসবাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া*, ২/১১২ ও ইবনে আবি শাইবা, *আলমুসান্নাফ*, ৭/২২৮।
[২৪] বাইহাকী, *আযযুহদুল কাবীর*, পৃষ্ঠা : ২২৭।
[২৫] আবু নুআইম আসবাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া*, ৫/১৭৭।
[২৬] আবদুল আযীয সালমান, *মাওয়ারিদুয যমআন লি দুরূসিয যামান*, ৩/২১৬।
[২৭] আবু নুআইম আসবাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া*, ৮/৩৪৭।

কাব আলআহবার রহ. বলেন, 'মৃত্যুর পরিচয় যে উপলব্ধি করে, পার্থিব জীবনের বিপদ-আপদ ও চিন্তা-দুশ্চিন্তা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।'[২৯]

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মৃত্যুকে স্মরণ করার মাধ্যমে নেক আমলে উদাসীনতা ও শিথিলতার ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট হতেন। হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. একদিন চলার পথে একটি কবরস্থান দেখে সাওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। সফরসঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো ইতঃপূর্বে কখনো এরূপ করেননি। এরূপ করার কারণ কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কবরবাসীকে স্মরণ করে এবং তাদের ও আল্লাহর মাঝে যা অন্তরায় হয়ে আছে, তার স্মরণ করে দু' রাকাত নামাযের মাধ্যমে আমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি।'[৩০]

সালফে সালেহীন ও পূর্বসূরিগণ মৃত্যুচিন্তা ও মৃত্যুভীতিকে সৎকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে গণ্য করেননি। তাদের দৃষ্টিতে মৃত্যুচিন্তা ছিল নেক আমল ও ইলমে দ্বীন অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়; বরং উদ্বুদ্ধকারী। মৃত্যুচিন্তায় তারা অধিক পরিমাণে নেক আমল সম্পাদনে সচেষ্ট হতেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—মৃত্যু যখন উপস্থিত হবে, মৃত্যুকে বরণ করে নেব পূর্ণ প্রস্তুত চিত্তে। মাআ'ফী বিন যাকারিয়া রহ. জনৈক নির্ভরযোগ্য রাবীসূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত রাবী আবু জাফর তাবারী রহ.-এর মৃত্যুশয্যায় তার কাছে উপস্থিত ছিল। এর ঘণ্টাখানেক পর বা তারও পূর্বে তাবারী রহ. ইন্তেকাল করেন। উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি তাবারী রহ.-কে শোনাল যে, জাফর বিন মুহাম্মাদ বলেছেন, হারাম শরীফে পৌঁছে বাইতুল্লাহর দেয়ালে হাত রেখে প্রথমে মহান আল্লাহ তাআলাকে নিম্নোক্ত শব্দে সম্বোধন করে তারপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে—

يَا سَابِقَ الْفَوْتِ! وَسَامِعَ الصَّوْتِ! وَيَا كَاسِيَ الْعِظَامِ لَحْمًا بَعْدَ الْمَوْتِ!

---

[২৮] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ৪/৪৫১।

[২৯] আবু নুআইম আসবাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া*, ৬/৪৪ ও আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ৪/৪৫১।

[৩০] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ৪/৪৮৬।

মৃত্যুকে অতিক্রমকারী, সকল ধ্বনি শ্রবণকারী, মৃত্যুর পর অস্থি-মজ্জাকে পুনরায় গোশতের আবরণ দানকারী হে মহান সত্তা!

এ কথা শুনে তাবারী রহ. তার খাদেমকে দোয়াত-কাগজ আনতে বললেন এবং রেওয়ায়েতটি লিখে নিলেন। উপস্থিত কেউ প্রশ্ন করল, 'এই মুমূর্ষু অবস্থায়ও লিখছেন?!' তাবারী রহ. উত্তর দিলেন, 'মানুষের কর্তব্য মৃত্যু পর্যন্ত কখনই ইলমের তৃষ্ণা ও অনুসন্ধান পরিত্যাগ না করা।'[৩১]

(বসরা মসজিদের ইমাম) ফারক্বাদ রহ. হতে বর্ণিত, লোকজন সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর মৃত্যুশয্যায় তার কাছে উপস্থিত হলো। এ সময় উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি তাকে একটি হাদীস রেওয়ায়েত করে শোনালে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং হাত দ্বারা বিছানায় আঘাত করলেন। এরপর একটি ফলকে হাদীসটি লিখে নিলেন। লোকজন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'এ অবস্থায়ও ইলমের তলব?!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এটি একটি উত্তম বর্ণনা। যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে একটি উত্তম রেওয়ায়েত শ্রবণ করলাম আর যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে একটি উত্তম রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করলাম।'[৩২]

কাযী ইবরাহীম বিন জার্‌রাহ আলকুফী রহ. আপন উসতায ইমাম কাযী আবু ইউসুফ রহ.-এর মৃত্যুকালীন বিস্ময়কর অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু ইউসুফ অসুস্থ হলে আমি তার শুশ্রূষার উদ্দেশে গমন করলাম। আমি গিয়ে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলাম। জ্ঞান ফেরার পর আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, 'ইবরাহীম! এই মাসআলায় তোমার কী মত?' আমি অবাক হয়ে উত্তর দিলাম, 'হযরত! এই অবস্থায়ও ইলমী আলোচনা?!' তিনি বললেন, 'কোন সমস্যা নেই; আমরা আলোচনা করি। হয়তো এতে কোন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।' এরপর তিনি বললেন, 'ইবরাহীম! হজকর্ম সম্পাদনকালে পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে কে উত্তম? আরোহী অবস্থায় নিক্ষেপকারী, না-কি পায়ে হেঁটে নিক্ষেপকারী?' আমি উত্তর দিলাম, 'সাওয়ারী ব্যক্তি।' তিনি বললেন, 'ভুল বললে।' আমি পুনরায় উত্তম দিলাম, 'তাহলে হেঁটে হেঁটে

---

[৩১] ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশ্‌ক*, ৫২/১৯৯।

[৩২] আবু নুআইম আসবাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, ৭/৬৪।

নিক্ষেপকারী।' এবারও তিনি বললেন, 'ভুল বললে।' আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তাহলে আপনার মতামত কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যে ব্যক্তি সেখানে দোয়ার জন্য দাঁড়াবে, তার জন্য উত্তম হলো হেঁটে হেঁটে নিক্ষেপ করা আর যে ব্যক্তি দোয়ার জন্য দাঁড়াবে না, তার জন্য উত্তম হলো সাওয়ারী অবস্থায় পাথর নিক্ষেপ করা।' ইবরাহীম বলেন, 'এরপর আমি তার কাছ থেকে উঠে চলে এলাম। তখনও বাড়ির দরজায় পৌঁছিনি, এরই মধ্যে পেছন থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। অর্থাৎ মহান ইমাম মৃত্যুবরণ করেছেন!'[৩৩]

ফকীহ আবুল হাসান আলী বিন ঈসা রহ. বর্ণনা করেন, আবু রাইহান আল বিরূনী রহ. যখন জীবনের শেষ সময়ে উপনীত, তখন আমি তার কাছে উপস্থিত হলাম। ইতোমধ্যে তার মৃত্যুযন্ত্রণা ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে তিনি মারা যাবেন। মৃত্যুপূর্ব এই চরম মুহূর্তে আলবিরূনী আমাকে বললেন, 'তুমি একদিন আমাকে নানীর মাসআলা কীরূপ যেন বলেছিলে?'

আল্লাহু আকবার! মৃত্যুযন্ত্রণার চরম কঠিন ও কষ্টকর মুহূর্তে (জটিলতম) মিরাস অধ্যায়ের মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন!

ফকীহ আবুল হাসান বলেন, তার অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমি বললাম, 'এই অবস্থায়?!'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আরে! এই মাসআলা না জেনে দুনিয়াত্যাগের চেয়ে মাসআলাটি জেনে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া কি আমার জন্য উত্তম নয়?!'[৩৪]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি মাসআলাটি শিখে নিতে চাচ্ছেন। পার্থিব কোন স্বার্থ নেই, কেবল ইলম অর্জনের জন্য। কারণ, তিনি জানতেন ইলম ও আহলে ইলমের অত্যুচ্চ ও সমুন্নত মর্যাদার কথা।

---

[৩৩] ইবনে মুআযযাম শাহ কাশ্মীরি, *আলআরফুশ শাযী*, ২/৩৫৮।
[৩৪] সাফাদী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১/১০৭০।

আলবিরূনীর অনুরোধে ফকীহ্ আবুল হাসান পুনরায় মাসআলাটি আলোচনা করলেন এবং আলবিরূনীকে মাসআলাটি শিখিয়ে ও মুখস্থ করিয়ে দিলেন।

আবুল হাসান বলেন, 'এরপর আমি সেখান থেকে উঠে এলাম। পথেই আমি তার মৃত্যুশোকে ক্রন্দনরত ব্যক্তিদের আওয়াজ শুনতে পেলাম।'[৩৫]

আল্লাহু আকবার! দ্বীনী একটি মাসআলা শেখার ক্ষণকাল পরই মৃত্যুবরণ করলেন আলবিরূনী! তার এবং তার মতো মনীষীদের কাছে মৃত্যু ছিল জীবন ও নেক আমলের নাম। মৃত্যুর মুহূর্তকেও তারা কাজে লাগাতেন আগামীর জন্য, পরকালের জন্য।

---

[৩৫] ইয়াকুত আলহামাবী, *মু'জামুল উদাবা*, ১৭/১৮১-১৮২।

জীবনের শেষ রমযান
নববী শিক্ষার দাবি

প্রিয় পাঠক! আশা করি, উপরের আলোচনায় এ বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান—এটি নিছক দর্শনসূত্রের ধারণানির্ভর বিষয় নয়; বরং সম্পূর্ণই বাস্তব ও অতি সম্ভব বিষয়। আর এই অনুভূতি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া নববী শিক্ষারও দাবি। আমাদের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাও এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন ও সুদৃঢ় করে। আমাদের প্রিয়জন-পরিচিতজনদের অনেকেই গত রমযানে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, একসঙ্গে সাহরী-ইফতার করেছেন, তারাবীহ আদায় করেছেন; কিন্তু আজ তারা নির্জন কবরবাসী! তারা কেউ কি ভেবেছিলেন, আগামী রমযানের 'হিলাল' আমার জীবনে আসবে না? মৃত্যু তো এমন হঠাৎ করেই আগমন করে। আর মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনের পর কেউই পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে পারে না। পবিত্র কোরআনের ভাষায়—

﴿حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ○ لَعَلِّيْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَ مِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾

পরিশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন; যাতে আমি যা (অর্থাৎ যে দুনিয়া) ছেড়ে এসেছি, সেখানে গিয়ে সৎ কাজ করতে পারি। কখনো না। এটা একটা কথার কথা, যা সে মুখে বলছে মাত্র। তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) সামনে রয়েছে 'বরযখ', যা তাদেরকে পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। [সূরা মুমিনূন : ৯৯-১০০]

সুতরাং মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন অসম্ভব ও অসাধ্য একটি বিষয়। অবশ্য মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের কামনা করে; গোনাহগার হলে তাওবা করতে আর নেককার হলে আমলনামাকে সমৃদ্ধ করতে!

আচ্ছা, আগামী রমযান শেষে আমি ও আমরা যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কী হবে?! আমরাও নিশ্চয়ই তখন কামনা করব পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে নতুন করে রমযানের রোযা আদায় করতে। আমরা চাইব এমন করে মাহে রমযান কাটাতে, যা আমাদের আরও বেশি কাজে আসবে কবরে এবং আখিরাতে। তাহলে আসুন, কিছুক্ষণের জন্য মনে করি যে,

আমরা মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে এসেছি, শেষবারের মতো সুযোগ পেয়েছি জীবনের এই শেষ রমযানটিতে 'জীবন'কে সুন্দর করে সাজাতে; সুদীর্ঘ অতীত জীবনে যা ছুটে গেছে, তার প্রতিকার বিধান করতে; নেক আমলের দফতর সমৃদ্ধ করতে এবং মহা পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সঙ্গে সুন্দরতম সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে।

আশা করা যায়, এই অনুভূতিকে ধারণ করতে পারলে আমাদের এই মোবারক মাসের প্রস্তুতি ও আমল সার্থক হবে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে, এ ধরনের চিন্তা লালন করা তো অশুভ ভাবনা, যা দুঃখবাদ ও নেতিবাচক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত! না, এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি হলো নেক আমলে সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি। একই সঙ্গে তা ত্যাগ ও কোরবানী, অর্জন ও জীবনকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী অনন্য এক চিন্তাধারা। মুসলিম জাতির সামরিক ইতিহাস পাঠ করে দেখুন। মৃত্যুর প্রতীক্ষা ও মহান আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি—এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাকে লালন করার কারণেই মুসলিম অভিযাত্রীগণ অনেক সামরিক অভিযানে জয়লাভ করেছেন, পৃথিবী তাদের পদানত হয়েছে।

কী চমৎকার উক্তি আল্লাহর কোষমুক্ত তরবারী মহান সাহাবী খালিদ সাইফুল্লাহ রাযি.-এর! পারস্য সেনাপতি হুরমুযের সামনে মুসলিম বাহিনীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.

বলেছিলেন—'আমি এমন কিছু সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, মৃত্যুকে তারা তেমন ভালোবাসে, যেমন ভালোবাস তোমরা জীবনকে।'[৩৬]

মৃত্যুকে ভালোবাসা এই মহান কাফেলাই বাস্তবায়ন করেছিল গৌরবের দাস্তান! অর্জন করেছিল মর্যাদাকর অবস্থান! তাদের কতক তো লাভ করেছিলেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার গৌরব আর অধিকাংশই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন পৃথিবীর অধিকারী হয়ে, পৃথিবীকে পদানত করে। কিন্তু পৃথিবী কখনই তাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারেনি। কীভাবে করবে, তারা যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মৃত্যু তাদের দুয়ারে কড়া নাড়বে আজ কিংবা আগামীকাল!

---

[৩৬] ইবনুল জাওযী, *আলমুনতাযাম ফিত তারীখ*, ৪/১০১, তাবারী, *তারীখুর রুসূল ওয়াল মুলূক*, ২/৫৫৪।

জীবনের শেষ রমযানে
আমার নামায

এতক্ষণে আমি যদি আস্থার সঙ্গে এ চিন্তায় বিশ্বাসী হই যে, আগামী রমযানই আমার যিন্দেগীর সফরের আখেরী রমযান, তাহলে এই রমযানে আমার নামায কেমন হবে? আমার নামায হবে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলিতে সমৃদ্ধ—

১. প্রতিটি ফরয নামায আদায় করব মসজিদে জামাতের সঙ্গে

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً»

জামাতে আদায়কৃত নামাযের মর্যাদা একাকী আদায়কৃত নামাযের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি।[৩৭]

সুতরাং এ অত্যুচ্চ ফজিলত লাভ করতে চাইলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতে আদায় করার প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে। বিষয়টি কেবল অধিক ফজিলতলাভেই সীমাবদ্ধ নয়। মসজিদের জামাত পরিত্যাগকারী সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ... »

---

[৩৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫০।

যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! আমার ইচ্ছা হয় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই, তারপর নামায কায়েমের নির্দেশ দিই। এরপর আযান হলে এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়ে আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা জামাতে শরীক হয়নি) ঘর জ্বালিয়ে দিই।[৩৮]

এই কঠিন সতর্কবাণীর দাবি হলো প্রতিটি মুসলিম পুরুষ জামাতে নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হবে এবং জামাত লাভের উদ্দেশ্যে আউয়াল ওয়াক্তেই মসজিদে উপস্থিত হবে। শুধু তাই নয়; বরং প্রত্যেক নামায নিয়মিত প্রথম কাতারে আদায়ে সচেষ্ট হবে। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا ...»

আযান ও প্রথম কাতারে কী (ফজিলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, আর লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ ব্যতীত যদি এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব না হতো, তাহলে অবশ্যই তারা লটারির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিত।[৩৯]

২. নামায আদায় করব বিনম্র-প্রকম্পিত চিত্তে, খুশু-খুযু সহকারে

আমি যদি বিশ্বাস করে থাকি যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমি কখনো আমার ওপর আরোপিত মহান আল্লাহ তাআলার কোন ফরযের ব্যাপারে সামান্য অবহেলা করব না। আমার চেষ্টা থাকবে প্রতিটি ফরযকে সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায়ের। নামাযের মধ্যে আমার মন এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত বিচরণ করবে না। আমি নামায আদায় করব খুশু-খুযু সহকারে, মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিনীত-সমাহিত হয়ে।

---

[৩৮] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৪৪ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬৫১।
[৩৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬১৫ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৪৩৭।

কাকের মতো ঠোকর মেরে আমি নামায আদায় করব না, নামায আদায় করব ধীরে ধীরে, দীর্ঘ কেরাত, দীর্ঘ রুকূ-সিজদা সহকারে। আমি কেবল নামায আদায় করব না, নামাযকে উপভোগ করব, নামাযে প্রশান্তি খুঁজে নেব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ»

আর নামাযে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে।[৪০]

নামাযে প্রকৃত খুশু-খুযু অর্জনের অতি উত্তম ও চমৎকার একটি পদ্ধতি হলো অন্তরে আল্লাহপ্রেমের বীজ রোপণ করা। কেননা, মানুষের স্বভাব-দাবি হলো সে যাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে, তার সাক্ষাতে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। অস্থির হৃদয়ে সে প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভের পথ ও সুযোগ খুঁজতে থাকে। সাক্ষাতের সময় ঘনিয়ে এলে সে বারবার অস্থির চিত্তে ঘড়ির দিকে তাকায় আর ভাবতে থাকে, কী হলো আজ হতচ্ছাড়া ঘড়ির কাঁটার, নড়ছেই না যে ...! এরপর যখন সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি উপস্থিত হয়, শেষ হয় প্রতীক্ষার সবগুলো ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ও সেকেন্ডের ভগ্নাংশ; প্রিয়তমের সাক্ষাতে সে অগ্রসর হয় দেহ-মনে অপূর্ব রোমাঞ্চ ও শিহরণ ধারণ করে। সাক্ষাৎ-পর্ব যতই দীর্ঘ হোক, মনে-প্রাণে সে কামনা করে, এ সাক্ষাৎ যেন শেষ না হয়! একটু পূর্বেও যে ভাবছিল, ঘড়ির কাঁটাটা নড়ছে না কেন, এখন সে-ই ভাবতে থাকে, আহ! সময়ের প্রবাহ যদি থেমে যেত! সাক্ষাৎ শেষে সে ভাবতে থাকে, আবার কবে আসবে পরবর্তী সাক্ষাতের প্রতিশ্রুত দিন? হায়! আর কত দিন?!

ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের এই আমাদের স্বভাবধর্ম।

আর নামাযের সময় হলে ...?!

আমাদের মাঝে কি জেগে ওঠে এই অনুভব, এই অনুভূতি? এই অস্থিরতা ও এই শিহরণ?

উত্তর যদি হয়, 'হ্যাঁ', তাহলে শোকর আল্লাহর! আমি ভালোবাসি আমার রবকে, আমার আল্লাহকে।

---

[৪০] *সুনানে নাসায়ী*, হাদীস নং ৩৯৪০ ও *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১৪০৩৭।

আর উত্তর দিতে যদি দ্বিধা জাগে মনে, খুঁজতে থাকি অজুহাত-টালবাহানা, তাহলে তো আমি আমার রবকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসি না। হায় আফসোস! কী হবে আমার?!

এ তো ভয়াবহ দুর্যোগের কথা! এ যে মহা বিপর্যয়ের পদধ্বনি! কী সে বিপদ?!

﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

(হে নবী! মুসলিমদেরকে) বলুন, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তার রাসূল এবং তার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা পছন্দ কর, তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না। [সূরা তাওবা : ২৪]

বলুন, আমি ও আমরা কি আমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, জীবনসঙ্গী ও আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাতের চেয়ে নামাযে অধিক আনন্দ অনুভব করি?

দীর্ঘ সফর শেষে ফিরে আসার পর প্রিয়জনদের সাক্ষাৎলাভের জন্য যেমন অস্থিরতা ও চঞ্চলতা অনুভব করি, তেমন অস্থিরতা ও চঞ্চলতা কি অনুভব করি আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের জন্যও?

প্রচুর অর্থ-সম্পদ যদি আমার সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করে, তখন যেমন আনন্দ অনুভব করি, তেমন আনন্দ কি অনুভব করি নামাযের পরও?

বাজারমন্দার কারণে ব্যবসায় সমূহ ক্ষতির আশঙ্কায় যেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই, তেমন আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কি হই নামায কবুল না হওয়ার?

শেষ রাতের নির্জন প্রহরে দু' রাকাত তাহাজ্জুদ আদায় করতে পেরে কি তেমন রোমাঞ্চিত হই, যেমন রোমাঞ্চিত হই বহুদিনের প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের পর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের মনোরম-চমৎকার বাড়িটি নির্মাণ করতে পেরে? কোরআন যেমন বলেছে—'পছন্দের বাড়ি'!

আমি আল্লাহকে ভালোবাসি কি-না, আমার আল্লাহপ্রেমের পরিমাণ কতটুকু, তা পরিমাপ করার জন্য এ মাপকাঠিই আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহপ্রেম নির্ণয়ের এই মাপকাঠি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়; মিথ্যা দাবির বা প্রতারণার কোন অবকাশ এখানে নেই। সুযোগ নেই মিথ্যা প্রেমের দাবি করার, অবকাশ নেই বাস্তব জীবনে এ দাবিবিরোধী কাজ করে, এ দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেও সারা জীবন এই কল্পনার ফানুস ওড়ানোর যে, আমি তো আল্লাহকে অনেক ভালোবাসি! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ﴾

মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি। তবে এই বল যে, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। [সূরা হুজুরাত : ১৪]

অর্থাৎ বিশ্বাসের দাবি তো অনেকেই করে; কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী, প্রেমে বিভোর, আনুগত্যের পরাকাষ্ঠায় উন্নীত এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামী তো স্বল্প, অতি অল্প!

সুতরাং প্রিয় পাঠক! এখানে একটু থামি, কিছুক্ষণ পাঠ স্থগিত রাখি। একটু ভাবি, বিবেকের দুয়ার উন্মুক্ত করে কতক্ষণ চিন্তা করি।

এবার পূর্ণ আস্থার সঙ্গে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই, একেবারে স্বচ্ছ-সুস্পষ্ট ভাষায়।

আবারও বলছি, বর্ণিত মানদণ্ডে যদি আমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকি, তাহলে শোকর আল্লাহর।

আর যদি তা না হয়, তাহলে সাবধান, যা করার দ্রুতই করতে হবে!

দ্রুত হৃদয়ে সৃষ্টি করতে হবে আল্লাহপ্রেম।

সেদিন আসার পূর্বেই ...!

যেদিন ...

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾

যেদিন কোন অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ অন্তর নিয়ে।

[সূরা শুআ'রা : ৮৮-৮৯]

ভুলে যাবেন না, এটি সাধারণ কোন বিষয় নয়, ঈমানের প্রশ্ন। যে ব্যক্তি আল্লাহপ্রেমের উপর কোন প্রেমকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ঈমান তো অসম্পূর্ণ! সে তো দাঁড়িয়ে আছে পতনোন্মুখ গহ্বর কিনারে। সে কিছুতেই পাবে না ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّه إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»

তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়– ১. আল্লাহ ও তার রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর তুলনায় প্রিয় হয়। ২. কাউকে ভালোবাসলে নিখাদ আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে। ৩. কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে তেমন অপছন্দ করে, যেমন অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।[৪১]

---

[৪১] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৬ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৪৩।

বরং অন্য এক রেওয়ায়েতে তো ঈমানের মিষ্টতা লাভের সম্ভাবনা পুরোপুরিই অস্বীকার করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَحَتّٰى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ، وَحَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»

কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে কাউকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসবে, যে কুফরি থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন, তার দিকে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক প্রিয় মনে করবে এবং যতক্ষণ না আল্লাহ ও তার রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবেন।[৪২]

নবীজী এ হাদীসে বলেছেন, 'ঈমানের স্বাদ পাবে না'। একেবারে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ঘোষণা! আর ঈমানের মিষ্টতা যার হৃদয়ে নেই, সে কী করে অর্জন করবে নামাযের খুশু-খুযু?!

৩. নামাযে দীর্ঘ দোয়া

নামায হলো দোয়া কবুলের অন্যতম ক্ষেত্র। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিভিন্ন অংশে প্রচুর দোয়া করতেন। নামাযের সূচনাতে তাকবীরে তাহরীমার পর দোয়ার মাধ্যমেই তিনি নামায শুরু করতেন। নামাযের সূচনাতে কৃত প্রিয় নবীজীর বিভিন্ন দোয়া-বাক্য হাদীসের সুসমৃদ্ধ ভান্ডারে সংরক্ষিত আছে।

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর কেরাতের পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি নবীজীকে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-

[৪২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৪১।

পিতা আপনার উপর কোরবান হোক! আপনি তাকবীর ও কেরাতের মাঝে কী বলেন?' নবীজী উত্তর দিলেন, আমি বলি—

«اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেরূপ দূরত্ব আপনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিষ্কার করে দিন, যেরূপ পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হতে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহসমূহ ধুয়ে ফেলুন বরফ, পানি ও শিলা দ্বারা।[৪৩]

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّيْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় চাই অলসতা, অতিবার্ধক্য, গোনাহ ও ঋণের বোঝা থেকে; কবরের সংকট ও আযাব থেকে; জাহান্নামের সংকট ও আযাব থেকে এবং প্রাচুর্যের অনিষ্টতা থেকে। আমি আপনার পানাহ চাই দারিদ্র্য থেকে;

[৪৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৭৪৪ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৫৯৮।

আপনার আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমুদয় গোনাহ বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আমার অন্তর যাবতীয় পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করুন; যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। আমার ও আমার গোনাহসমূহের মধ্যে এতটা দূরত্ব আপনি সৃষ্টি করে দিন, যতটা দূরত্ব আপনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে করেছেন।[৪৪]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সিজদাতে অধিক পরিমাণে তাসবীহ পাঠ করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সিজদায় এই দোয়া পড়তেন,

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ»

হে আল্লাহ! আমার রব! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[৪৫]

নবীজী সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করতে বলেছেন। কেননা, সিজদা হলো বান্দার আপন রবের সবচে নিবিড় সান্নিধ্যলাভের মুহূর্ত। সিজদা অবস্থায় দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّه، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»

সিজদা অবস্থায়ই বান্দা তার রবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব, তোমরা (সিজদায়) অধিক পরিমাণে দোয়া করবে।[৪৬]

প্রশ্ন হতে পারে, কেন সিজদার হালতে দোয়া কবুলের আশা তুলনামূলক বেশি? এর পেছনে হেকমত ও গুপ্ত রহস্যই বা কী?

---

[৪৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৩৬৮।

[৪৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৭৯৪ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৪৮৪।

[৪৬] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৪৮২।

এর উত্তর হলো—সিজদা হচ্ছে পুরো নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বিনম্রতাপূর্ণ রোকন। সিজদার হালতেই আল্লাহর প্রতি বান্দার সবচেয়ে অধিক বিনয় প্রকাশ পায়। যে কপালকে ভাবা হয় মানুষের সম্মানের প্রতীক, সিজদায় বান্দা তা আল্লাহর সামনে বিনয়ে অবনত করে। যে নাসিকাকে মানুষ ভাবে গৌরব ও অহংকারের প্রতীক, সিজদায় বান্দা সেই নাসিকা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সিজদা চূড়ান্ত বিনয়ের প্রতীক বলেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোন মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সামনে সিজদা করতে রাজী হবে না। সুতরাং সিজদা হচ্ছে বিশ্বজগতের রবের প্রতি বান্দার নিঃশর্ত দাসত্বের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। বান্দা যদি এ সম্পর্কের দাবি ও প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারে, তখন তার দোয়া কবুলের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ﴾

> (হে নবী!) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন যে,) আমি রয়েছি অতি সন্নিকটে।
>
> [সূরা বাকারা : ১৮৬]

অর্থাৎ আল্লাহ তো সর্বদা বান্দার সন্নিকটেই আছেন। কিন্তু যে বান্দা এই সম্পর্ক ও নৈকট্যের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে না, সে কী করে লাভ করবে নৈকট্য ও সান্নিধ্যের স্বাদ?!

অবশ্য আমার মতে সিজদায় দোয়া কবুলের অধিক সম্ভাবনা থাকার পেছনে আরেকটি চমৎকার ও সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত রয়েছে। সিজদা হলো একটি রাকাতের সর্বশেষ রোকন। তাকবীর, সূরা ফাতিহা, কেরাত, রুকূ—অর্থাৎ একটি পুরো রাকাতের অন্য সব আমল যেন প্রার্থনার ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী। পুরো রাকাতে বান্দা আল্লাহর গুণকীর্তন ও মর্যাদা বর্ণনা করে রাকাতের শেষ অংশ সিজদায় উপনীত হয় এবং আল্লাহর কাছে আপন হাজত ও প্রার্থনা পেশ করে।

এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, এ বিষয়ে যত্নবান হতে

উৎসাহিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

> তোমরা রুকূতে তোমাদের রবের মহত্ত্ব বর্ণনা করবে এবং সিজদায় অধিক পরিমাণে দোয়া পড়বে। কেননা, তা (সিজদা) দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময়।[৪৭]

সুতরাং আমরা রুকূতে দোয়া করব না। কারণ, এখনও আমরা সেসব কার্যকারণ সমাপ্ত করিনি, যা আমাদেরকে দোয়া কবুলের নিশ্চয়তা দেবে। যখন আমরা রুকূসহ নামাযের অন্যান্য রোকনসমূহে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা, তাসবীহ ও মহত্ত্ব বর্ণনা করব, ইসতেগফার ও ওজর পেশ করব, পরবর্তী সিজদায় আমাদের দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

প্রসঙ্গত জেনে রাখা প্রয়োজন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পেয়ারা উম্মতকে উপরিউক্ত নসীহত করেছেন জীবনের শেষভাগে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়। সুতরাং ভেবে দেখুন, কত গুরুত্বপূর্ণ নসীহত এবং কত অত্যুচ্চ স্তরের কল্যাণকামিতা! আপন উম্মতের কাছে কল্যাণের বার্তা পৌঁছিয়ে দিতে কতটা পাগলপারা ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মৃত্যুশয্যার প্রচণ্ড কষ্ট ও অসহ্য যন্ত্রণার সময়ও কেবল উম্মতের কল্যাণচিন্তা!

সম্ভবত এই একই কারণে নামাযের শেষাংশে তাশাহহুদের পরও দোয়ার বিধান রাখা হয়েছে। সুতরাং নববী সুন্নাত হলো—আমরা নামাযের দুই গুরুত্বপূর্ণ রোকনে বেশি বেশি দোয়া করব—সিজদায় ও তাশাহহুদের পর সালাম ফেরানোর পূর্বে। সিজদা যেমন একটি রাকাতের সর্বশেষ আমল এবং নববী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাব্যতম ক্ষেত্র, তেমনি তাশাহহুদও হচ্ছে পুরো নামাযের সর্বশেষ আমল। পুরো নামাযের

---

[৪৭] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৪৭৯।

প্রতিটি রোকনে আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার মর্যাদা বর্ণনা ও গুণকীর্তন করেছি; এখন সময় এসেছে আল্লাহর কাছে চাওয়ার ও প্রার্থনা করার। এ কারণেই তাশাহহুদের পর এবং সালামের পূর্বে পাঠ-উপযুক্ত অনেক দোয়া সংরক্ষিত আছে হাদীসে নববীর সমৃদ্ধ ভান্ডারে।

এখান থেকেই আমরা এ বিধানের গূঢ় রহস্যও অনুধাবন করতে পারব যে, কুনূতের বিধান আল্লাহ তাআলা বিতরের নামাযে কেন রেখেছেন? রাতের দীর্ঘ একটি অংশ নামাযে কাটানোর পর, প্রতিটি রাকাতের প্রত্যেকটি রোকনে আল্লাহর তাকবীর ও মহত্ত্ব, হামদ ও প্রশংসা, তামজীদ ও মর্যাদা বর্ণনা করার পর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় দোয়া ও প্রার্থনার, অনুনয় ও মিনতির। দেখুন, প্রাপ্তির সেই পরম মুহূর্তে প্রিয় নবীজী আল্লাহর কাছে প্রার্থনার কী চমৎকার এক নমুনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হযরত হাসান বিন আলী রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজী আমাকে বিতর (নামাযের কুনূত)-এ পাঠ করার জন্য কিছু কালিমা শিখিয়ে দিয়েছেন।[৪৮] কালিমাগুলো হলো—

«اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ، وَإِنَّه لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

হে আল্লাহ! যাদের আপনি হিদায়াত দান করেন, তাদের সঙ্গে আমাকেও হিদায়াত দান করুন। যাদের আপনি অকল্যাণ হতে দূরে রেখেছেন, তাদের সঙ্গে আমাকেও অকল্যাণ হতে দূরে রাখুন। যাদেরকে আপনি আপনার অভিভাবকত্বে রেখেছেন, তাদের সঙ্গে আমাকেও আপনার অভিভাবকত্বে রাখুন। আপনি যা দান করেছেন, তাতে বরকত দিন। আপনি আমার তাকদীরে যা রেখেছেন, তার অসুবিধা হতে আমাকে রক্ষা করুন। ফয়সালা একমাত্র আপনি করেন, আপনি ব্যতীত কেউ ফয়সালা করতে

---

[৪৮] নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিতরের নামাযে পঠিত বিভিন্ন দোয়া হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। দোয়ায়ে কুনূত হিসেবে এর যে কোন একটি পাঠ করা যায়। (অনুবাদক)

পারে না। আপনি যার বন্ধু, তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। হে আমার রব! আপনি তো মহিমান্বিত ও পবিত্র।[৪৯]

অর্থাৎ পুরো রাতের নামাযের পর বা আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে একটি দিনের সকল ইবাদতের পর আমরা আমাদের সারাদিনের দীর্ঘ ইবাদতধারার সমাপ্তি ঘটাচ্ছি এক সুসমৃদ্ধ দোয়ার মাধ্যমে। সে দোয়ায় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি হিদায়াত ও পথনির্দেশ, আফিয়াত ও নিরাপত্তা এবং বরকত ও কল্যাণধারা। আর এ সবকিছুই প্রার্থনা করছি সারা দিনের সকল নামাযে মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করার পর।

---

[৪৯] *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ৪৬৪, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৪২৫, *সুনানে নাসায়ী*, হাদীস নং ১৭৪৫ ও *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১৭১৮।

আমার প্রতিজ্ঞা

আগামী রমযান-ই আমার জীবনের শেষ রমযান। এই রমযানে আমি—

- পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করব মসজিদে।
- নামাযের প্রস্তুতি নেব ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব হতেই।
- পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে সচেষ্ট হব প্রথম কাতারে।
- পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করব জামাতের সাথে।
- নামায আদায় করব খুশূ-খুযূ সহকারে, বিনম্র-প্রকম্পিত চিত্তে।
- হৃদয়ে রোপণ করব আল্লাহপ্রেমের বীজ।
- নামায আদায় করব স্থির ও পূর্ণ সমাহিত চিত্তে।
- নফল নামাযে সিজদার হালতে বেশি বেশি দোয়া করব।
- সিজদায় অনুভব করব রব্বে কারীমের নিবিড় সান্নিধ্যের স্বাদ।
- রমযানের পূর্বেই মুখস্থ করে নেব নামাযে পাঠ-উপযুক্ত বিভিন্ন দোয়া।

জীবনের শেষ রমযানে
আমার রোযা ও সিয়াম-সাধনা

যদি আমি প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাস করে থাকি যে, আগত রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমি প্রতিটি রোযা আদায়ে পূর্ণ যত্নবান হব। আমি সচেষ্ট থাকব, আমার একটি রোযাও যেন কোন কারণে ত্রুটিযুক্ত বা অপূর্ণাঙ্গ না হয়ে যায়। (হাদীসের ভাষ্যমতে) অনেক রোযাদার তো এমন আছে, যাদের রোযা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা ব্যতীত আর কিছুই অর্জিত হয় না!

আমি কেবল যথার্থভাবে রোযা আদায় করেই ক্ষান্ত হব না; বরং মনে করব রোযার প্রতিটি মুহূর্ত আমি কাটাচ্ছি আল্লাহর রাস্তায়, আর তাই আমার প্রত্যাশা প্রতি মুহূর্তে 'আজরে জিহাদ'! কেননা, আমি আমার রোযার প্রতিটি মুহূর্তে আমার নফস ও প্রবৃত্তি, শয়তান ও পার্থিব কামনার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»

> যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিতে, শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমযানের রোযা রাখবে, পূর্বে কৃত তার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৫০]

আল্লাহ তাআলা অন্য সব ইবাদত হতে রোযাকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন এবং একে নিজের জন্য বলে ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই রোযার প্রতিদান আল্লাহ পাক নিজে দান করেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[৫০] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩৮ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৭৬০।

«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَه إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّه لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِه»

বনী আদমের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য; একমাত্র রোযা এর ব্যতিক্রম। কেননা রোযা শুধু আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমিই দেব![৫১]

এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রোযার প্রতি যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন এবং সর্বোত্তম পন্থায় তা আদায় করার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَه أَوْ شَاتَمَه فَلْيَقُلْ : إِنِّيْ صَائِمٌ -مَرَّتَيْنِ- وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه! لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَه وَشَرَابَه وَشَهْوَتَه مِنْ أَجْلِيْ، الصِّيَامُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِه وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»

রোযা ঢালস্বরূপ। তাই কেউ যেন রোযা রেখে অশ্লীলতা না করে এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করে। যদি কেউ তার সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় অথবা কটু কথা বলে, তাহলে সে যেন দু'বার বলে যে, 'আমি রোযাদার'। ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই সাওম আদায়কারীর মুখের (উপবাসজনিত) দুর্গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মেশকের ঘ্রাণের চাইতেও উৎকৃষ্টতর। (রোযাদার বান্দা) আমার জন্য পানাহার ও কামাচার পরিত্যাগ করে। সিয়াম আমার জন্য। আর এর প্রতিদান আমিই দেব! আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় দশ গুণ।[৫২]

---

[৫১] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৯০৪ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৫১।
[৫২] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৮৯৪।

রোযাদারকে কী বিনিময় দান করবেন দয়ালু আল্লাহ, তার সামান্য চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন উম্মতের দরদী নবী। নবীজী ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ. فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»

নিশ্চয়ই জান্নাতে 'রাইয়ান' নামে একটি দরজা আছে; কিয়ামতের দিন রোযাদারগণ তা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। অন্য কেউ তাদের সঙ্গে (সে দরজা দিয়ে) প্রবেশ করতে পারবে না। (দরজার সামনে হতে) আহ্বান করা হবেঃ রোযাদারগণ কোথায়? তখন রোযাদারগণ তা দিয়ে প্রবেশ করবে। সর্বশেষ রোযাদার প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে আর কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।[৫৩]

আর এই মোবারক মাসে রোযা রেখে গোনাহর চিন্তা! সে তো বড় ভয়াবহ! অতি ধ্বংসাত্মক! তা বরবাদ করে দেবে নেক আমলের দফতরকেও! তাই তো নবীজী বড় কঠিন ভাষায় সতর্ক করেছেন, উম্মত যেন এ মাসে গোনাহর কাছেও না যায়। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه»

যে ব্যক্তি (রোযা অবস্থায়) মিথ্যাচার ও অন্যায় কর্ম পরিহার করল না, তার পানাহার ত্যাগ করার প্রতি আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই (অর্থাৎ আল্লাহ তার পানাহার বর্জনকে কবুল করবেন না)।[৫৪]

---

[৫৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৮৯৬ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৫২।
[৫৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৯০৩।

এ কারণেই পুণ্যের পথের অগ্রপথিক যারা, সালিহীন ও শাকিরীন যারা, মাহে রমযানে তারা হয়ে যেতেন 'অন্য' মানুষ। আল্লাহর রেযা ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা সচেষ্ট হতেন সর্বোত্তম পন্থায় রমযানের রোযা আদায়ে। বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আহনাফ বিন কায়সের কথাই বলি। তাকে একবার কেউ বলল, আপনি তো বয়োবৃদ্ধ মানুষ। জীবনসফরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। রোযা তো আপনাকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার এ রোযা আগামীর এক দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি। শোন, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে কষ্ট স্বীকার করা তার আযাব বরদাশত করার চেয়ে অনেক সহজ।'[৫৫]

আরেক বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রহ. একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকগুলো বসে বসে হাসি-ঠাট্টা করছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা এ মাসকে তার মাখলুকের জন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্ররূপে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে বান্দারা এ মাসে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কেউ অগ্রবর্তী হয়ে সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়, আর কেউ পিছিয়ে পড়ে ব্যর্থতার শিকার হয়। বড় আফসোস ও বিস্ময় তাদের জন্য, যারা জয়-পরাজয়ের ও সাফল্য-ব্যর্থতার এই মাসে হাসি-ঠাট্টায় ও খেল-তামাশায় সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর শপথ! যদি প্রকৃত বাস্তবতা সবার দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হতো, তাহলে সৎকর্মশীলগণ ব্যস্ত থাকত তাদের সৎকর্ম নিয়ে আর বদকারগণ চিন্তাগ্রস্ত থাকত তাদের মন্দ কর্ম নিয়ে। অর্থাৎ সৌভাগ্যশীল বান্দার আনন্দের আতিশয্য তাকে বিস্মৃত করে দিত ক্রীড়া-কৌতুকের কথা, আর দুর্ভাগা বান্দার অনুতাপ তার সামনে রুদ্ধ করে দিত খেল-তামাশার দরজা।'[৫৬]

রোযা রাখার ক্ষেত্রেও মানুষের আছে স্তরবিন্যাস! রোযাদার সকলে এক স্তরের নয়। কেউ কেউ তো কেবল পানাহার ও কামাচার হতে বিরত থাকাকেই যথেষ্ট মনে করে। তাদের কাছে রমযানে দাবি ও মর্ম এতটুকুই।

---

[৫৫] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/২৩৬।
[৫৬] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/২৩৬।

আর কেউ কেউ অত্যুচ্চ এক স্তরের অধিকারী হতে সচেষ্ট হয়। তাদের রোযা কেবল উদর ও জননেন্দ্রিয়ের নয়; তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ রোযা রাখে। তাদের চোখ-কান, হাত-পা ও জিহ্বা প্রতিটি অঙ্গ বিরত থাকে আল্লাহর অবাধ্যতা হতে, হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ হতে। প্রতিটি অঙ্গকে তারা কাজে লাগায় আল্লাহর আনুগত্যে-ইবাদতে।

আর রোযার সর্বোচ্চ স্তর? সে স্তরে তো উন্নীত হন আল্লাহ তাআলার হাতে-গোনা প্রিয়তম কিছু বান্দা। মুসলমানদের দুর্লভ এক জামাত! তারা কেবল তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়; হৃদয় ও মন দিয়ে বিবেক ও পূর্ণ সত্তা নিয়ে নিমগ্ন হয়ে পড়েন ইবাদতে ও আল্লাহপ্রেমে। মাহে রমযানের একটি মুহূর্তেও তাদের হৃদয় ধাবিত হয় না পার্থিব কোন বিষয়ের দিকে, তাদের বিবেক বিচরণ করে না কোন অন্যায়ের পথে বা কোন কামনার পথে। আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য, যিকির ও স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এমন সব কিছু তাদের হৃদয়জগৎ থেকে হারিয়ে যায় রমযান মাসে।

কাজেই প্রিয় পাঠক! আপনিই এবার সিদ্ধান্ত নিন, আপনার জীবনের শেষ রমযানটিতে আপনার রোযা হবে কোন স্তরের– সাধারণ, অসাধারণ, না-কি অনন্যসাধারণ?!

আমার সিদ্ধান্ত

এবারের রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান। এই রমযানে আমি—

- প্রতিটি রোযা রাখব সর্বোত্তম পন্থায়।
- রোযা রাখব ঈমান ও ইহতিসাব সহকারে।
- রোযা রাখব আজরে জিহাদ লাভের প্রত্যাশায়।
- রোযা রেখে গোনাহ্ করা দূরে থাক, গোনাহ্র চিন্তাও করব না।
- আমার রোযা শুধু উদর ও জননেন্দ্রিয়ের নয়; আমার রোযা হবে হাত-পা, চোখ-কান, জিহ্বা, আত্মা ও হৃদয়ের।

জীবনের শেষ রমযানে
আমার রাত্রিজাগরণ

আমি যদি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে থাকি যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমি প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে মসজিদে তারাবীহ আদায় করব। তারাবীহর তেলাওয়াতে কোরআন আমাকে আপ্লুত করবে। হাফেয সাহেব পবিত্র কোরআনের শুরু থেকে শেষ প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিচরণ করবেন আর আমি অবগাহন করব কালামে ইলাহীর সৌন্দর্যে, নিমগ্ন হব মাআ'নিয়ে কোরআনের ভাবনায়। পেছনের জীবনের যাবতীয় পাপ মোচনের প্রত্যাশায় ইমাম সাহেবের সঙ্গে আমিও বিচরণ করব পবিত্র কালামের পাতায় পাতায়। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»

যে ব্যক্তি ঈমানের কারণে এবং শুধু আল্লাহর কাছে আজর লাভের প্রত্যাশায় রমযানের রজনীতে ইবাদত করবে (তারাবীহ ইত্যাদি পড়বে), পূর্বে কৃত তার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[৫৭]

রমযানের রজনীতে আমি নামাযে দণ্ডায়মান হব আল্লাহর অনুগ্রহ-দানে সিক্ত হতে। হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

রাত্রিকালে এমন একটি সময় আছে যে, কোন মুসলমান যদি আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কোন কল্যাণের প্রার্থনা করা

---

[৫৭] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩৭ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৭৫৯।

অবস্থায় সময়টির আনুকূল্য পায়, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন।[৫৮]

বরং কোরআনের মাস রমযানে আমি তারাবীহ আদায় করেই শুয়ে পড়ব না; দীর্ঘ তারাবীহ শেষে আমি ঘরে ফিরব কালামুল্লাহর শাওক ও মুহাব্বতকে সঙ্গী করে। ঘরে ফিরে আমি কোরআন নিয়ে বসব, কিছুক্ষণ কাটাব কোরআনের সঙ্গে। তারপর আবারও দাঁড়াব কিয়ামুল লাইলে, তাহাজ্জুদের নামাযে; আরও কিছুক্ষণ বিচরণ করব কালামুল্লাহর মায়াবী জগতে। ফজরের নামায আদায়ের পর আবারও বসব পবিত্র কোরআন নিয়ে, সূর্যোদয় পর্যন্ত বিচরণ করব পবিত্র কোরআনের পল্লবিত উদ্যানে। এ তো আমার রবের কালাম, ইলাহী ফরমান!

আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করব ইত্তেবায়ে রাসূলের এবং সালাফের অনুসরণের। হযরত মুগীরা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিজাগরণ করতেন (অথবা রাবী বলেছেন, নামায পড়তেন), এমনকি তার পদযুগল বা তার দু' পায়ের গোছা ফুলে যেত। নবীজীকে যখন বলা হলো যে, 'কেন এত কষ্ট করছেন (আল্লাহ তো আপনার জন্য আগাম মাগফিরাতের ঘোষণা দিয়েই দিয়েছেন)?' তখন তিনি উত্তর দিলেন,

«أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا»

তাই বলে কি আমি আল্লাহর শোকরগুযার বান্দা হব না?![৫৯]

সাহাবা-কাফেলা ও তাবেয়ীন-কাফেলার মহান সদস্যগণও এক্ষেত্রে ছিলেন সুন্নাতে নববীর স্বার্থক অনুসারী। তারাও রাত্রি জাগরণ করতেন, রাত জেগে নামায পড়তেন। পৃথিবী যখন নিদ্রাক্রোড়ে আশ্রয় নিত, বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. তখন দাঁড়িয়ে যেতেন

---

[৫৮] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৭৫৭।
[৫৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১১৩০ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৮১৯।

নামাযে। এরপর ভোর পর্যন্ত শুধু শোনা যেত মৌমাছির ন্যায় গুণগুণ আওয়াজ, একান্তের-নিভৃতের মধুর আলাপন![৬০]

সুফিয়ান সাওরী রহ. (ঘটনাক্রমে) এক রাতে পেট পুরে আহার করলেন। তারপর বললেন, 'গাধাকে ঘাস-পাতা বেশি দেওয়া হলে কাজও বেশি নেওয়া হয়।' এরপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন কিয়ামুল লাইলে এবং ভোর পর্যন্ত নিমগ্ন রইলেন নামাযে।

তাউস রহ. রাতে বিছানায় শরীর স্পর্শ করলেই ছটফট করতে থাকতেন, যেভাবে কড়াইতে শস্যদানা ফুটতে থাকে। এরপর দ্রুত বিছানা ছাড়তেন এবং ভোর পর্যন্ত নামাযে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি বলতেন, 'জাহান্নামের স্মরণ আবিদদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।'[৬১]

রবী' রহ. বলেন, আমি শাফেয়ী রহ.-এর বাড়িতে বহু দিন রাত্রিযাপন করেছি। রাতে তিনি অতি সামান্যই ঘুমোতেন।

আবুল জুওয়াইরিয়া রহ. বলেন, 'আমি ছয় মাস ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাহচর্যে ছিলাম। এ সময় কোন রাতে তিনি বিছানায় পিঠ লাগাননি।'

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর অভ্যাস ছিল—তিনি রাতের অর্ধাংশ ইবাদতে কাটাতেন। একদিন তিনি কিছু লোকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমের সময় তাদের বলাবলি করতে শুনলেন, 'ইনি তো সারা রাত ইবাদত করেন!' তখন তিনি মনে মনে বললেন, এরা আমার এমন গুণ বর্ণনা করছে, যা আমার মধ্যে নেই! এটা তো আমার জন্য লজ্জাজনক। এরপর থেকে তিনি সারা রাত জেগে থাকতেন এবং আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। বর্ণিত আছে, রাতের জন্য তার কোন বিছানা ছিল না।

কথিত আছে, হযরত মালেক বিন দীনার রহ. এক রাতে এই আয়াত পাঠ করে করে ভোর করে দিয়েছিলেন—

---

৬০ আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/৩৫৫।

৬১ আহমাদ বিন আলী আলমাক্বরীযী, *মুখতাসারু ক্বিয়ামিল লাইল লিল মারূযী*, পৃষ্ঠা : ৭০ ও আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/৩৫৫।

﴿اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾

> যারা অসৎ কার্যাবলিতে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেসব লোকের সম গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে? [সূরা জাছিয়া : ২১]

মুগীরা বিন হাবীব রহ. বলেন, আমি মালেক বিন দীনারকে লক্ষ করলাম। তিনি এশার পর অযু করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি নিজ দাড়ি ধরে কাঁদতে লাগলেন। কান্নার তোড়ে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তিনি বলতে লাগলেন, 'প্রভু আমার! মালেকের বার্ধক্যকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দাও। তুমি তো জান, কে জান্নাতবাসী হবে আর কে জাহান্নামী। মালেক দু' দলের কোন দলে? মালেকের আবাস দু'টির মধ্যে কোনটিতে?' ভোর পর্যন্ত তিনি এ কথা বলছিলেন আর কাঁদছিলেন।[৬২]

হাসান বসরী রহ. বলেন, 'রাত্রিজাগরণ ও সম্পদব্যয়ের চেয়ে কঠিন কোন আমলের কথা আমার জানা নেই।' একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের চেহারা সবার চেয়ে সুদর্শন হওয়ার কারণ কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তারা দয়াময় আল্লাহর সঙ্গে একান্তে সময় কাটায়। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আপন নূর হতে কিছু নূর দান করে সুদর্শন করে দেন।'[৬৩]

আমি যদি বিশ্বাস করে থাকি যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমিও সচেষ্ট হব সেই ইলাহী নূর অন্বেষণে, আল্লাহ পাক যা দ্বারা সিক্ত করেন তার রাতজাগা বান্দাদের।

জীবনের সর্বশেষ রমযানে যে আগ্রহী হবে রাত জাগতে, সে তো মুহূর্তকালের জন্যও গাফেল হবে না ইবাদত হতে, সে খুঁজবে না সামান্য

---

[৬২] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/৩৫৫।

[৬৩] আহমাদ বিন আলী আলমাক্বরীযী, *মুখতাসারু ক্বিয়ামিল লাইল লিল মারূযী*, পৃষ্ঠা : ৫৮, আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/৩৫৫ ও ইবনুল জাওযী, *আদাবুল হাসান বসরী*, পৃষ্ঠা : ৩৪।

বিশ্রাম। প্রকৃত বিশ্রাম ও শান্তি তো ক'দিন পরই জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের মাঝে!

সালাফের জনৈক বুযুর্গ একবার দীর্ঘ সফর শেষে ফিরে এলেন বাড়িতে। ক্লান্ত বুযুর্গের জন্য বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হলো, তিনি তাতে ঘুমিয়ে পড়লেন আর ছুটে গেল সেদিন রাতের নির্ধারিত আমল। ব্যথিত-অনুতপ্ত বুযুর্গ কসম করলেন, জীবনে আর কোনদিন বিছানার স্পর্শ গ্রহণ করবেন না!

রাত গভীর হলে আবদুল আযীয বিন রাওওয়াদ রহ. বিছানার কাছে আসতেন এবং বিছানায় হাত বুলিয়ে বলতেন, 'জানি, তোমার স্পর্শ বড় কোমল, বড় আরামদায়ক; কিন্তু আল্লাহর শপথ! জান্নাতে তোমার চেয়েও কোমল শয্যা আছে।' এরপর তিনি সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিতেন নামাযে ও ইবাদতে।[৬৪]

মালেক বিন দীনার রহ. বলেন, এক রাতে আমি আমার ওযিফা আদায় করতে ভুলে গেলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমি অনিন্দ্য সুন্দর এক তরুণীকে একটি কাগজের টুকরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি পড়তে পার?' উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ'। এরপর সে কাগজের টুকরাটি আমার হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল,

أَأَلْهَتْكَ اللَّذَائِذُ وَالْأَمَانِيْ   عَنِ الْبِيْضِ الْأَوَانِسِ فِي الْجِنَانِ

تَعِيْشُ مُخَلَّدًا لَا مَوْتَ فِيْهَا   وَتَلْهُوْ فِي الْجِنَانِ مَعَ الْحِسَانِ

تَنَبَّهْ مِنْ مَنَامِكَ إِنَّ خَيْرًا   مِنَ النَّوْمِ التَّهَجُّدُ بِالْقُرَانِ

ভোগ-উপভোগ আর আশা ও স্বপ্ন কি তোমায় ভুলিয়ে দিয়েছে জান্নাতের সুদর্শনা ললনাদের কথা?!

জান্নাতে তো তুমি থাকবে চিরকাল, মৃত্যু নেই সেখানে; আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত থাকবে সুদর্শনাদের সাথে।

---

[৬৪] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/৩৫৫।

ওঠ ঘুম থেকে। শোনো, ঘুমের চেয়ে উত্তম রাত জেগে কোরআন পাঠ তাহাজ্জুদে।[৬৫]

সুতরাং ইনশাআল্লাহ নিয়মিত আমরা তাহাজ্জুদ আদায় করব এবং কমপক্ষে এক আয়াত হলেও তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করব। হযরত আবু যর রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ান। তিনি নামাযে একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন এবং এভাবেই ভোর হয়ে যায়। আয়াতটি হলো–

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ। [সূরা মায়িদা : ১১৮][৬৬]

আমি যদি রমযানে কিয়ামুল লাইল ও রজনীর ইবাদতের স্বাদ পেতে চাই, তাহলে অবশ্যই গোনাহ হতে বিরত থাকার চেষ্টা করব। কারণ, গোনাহ মানবহৃদয়কে অন্ধকারচ্ছন্ন করে দেয় এবং রাত্রিজাগরণের স্বাদ হতে বঞ্চিত করে।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, 'মানুষ কোন গোনাহ করলে রাত্রি জাগরণের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে।'[৬৭]

ফুযাইল রহ. বলেন, 'তুমি যদি রাতে জাগ্রত থাকতে এবং দিনে রোযা রাখতে না পার, তাহলে বুঝে নিয়ো, তুমি বঞ্চিত; তোমার গোনাহর দফতর ভরে গেছে।'

---

[৬৫] আবু মুহাম্মাদ আলখালদী, *আলফাওয়াইদ ওয়ায যুহদ ওয়ার রাক্বায়িক্ব ওয়াল মারাছী*, পৃষ্ঠা : ২৫ ও আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/৩৫৫।

[৬৬] *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ১৩৫০।

[৬৭] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/৩৫৫ ও ইবনুল জাওযী, *আদাবুল হাসান বসরী*, পৃষ্ঠা : ৩০।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা সকলেই গোনাহগার। আমরা যদি গোনাহ করেও থাকি, তবুও কিছুতেই নিরাশ হব না রহমতে ইলাহী হতে। আমরা চেষ্টা করব রাত জাগতে এবং তাহাজ্জুদ আদায় করতে। দেখুন সিলাহ বিন আশইয়াম রহ.-এর কর্মনীতি। তিনি সারা রাত জেগে নামায আদায় করতেন। এরপর শেষ রাতে দোয়া করতেন, 'ইলাহী! আমার মতো (গোনাহগার) বান্দা তো জান্নাত দাবি করতে পারে না। কিন্তু আপনি আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিন।'[৬৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বিনিদ্র রজনীর ইবাদতের লযযত ও অনির্বচনীয় স্বাদ দান করুন।[৬৯]

---

[৬৮] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/৩৫৫।

[৬৯] আমাদের অনেকের কাছেই রাত জেগে ইবাদত করা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। ইমাম গাযালী রহ. তার কালজয়ী গ্রন্থ '*ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*'-এ রাত্রিজাগরণ সহজ হওয়ার চারটি বাহ্যিক ও চারটি আত্মিক শর্ত উল্লেখ করে লিখেছেন, এগুলো যারা পালন করবে, তাদের জন্য রাত্রিজাগরণ মোটেও কঠিন নয়। ইমাম গাযালী রহ. বর্ণিত শর্তগুলো হলো—

বাহ্যিক চার শর্ত :

১. অধিক আহার পরিহার করা; পাকস্থলিকে হালকা রাখা।
২. দিনের বেলা এত বেশি কায়িক পরিশ্রম না করা, যার কারণে শরীর অধিক অবসন্ন ও শিথিল হয়ে পড়ে।
৩. দিনে সামান্য সময় হলেও ঘুমানো। রাত্রিজাগরণে সহায়ক দিবা-নিদ্রা নবীজীর সুন্নাত।
৪. দিনের বেলা যথাসাধ্য গোনাহ থেকে দূরে থাকা।

আত্মিক চার শর্ত :

১. মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ, বিদআত ও জাগতিক অপ্রয়োজনীয় চিন্তা হতে মনকে পবিত্র রাখা।
২. মনে প্রবল ভয় রাখা, আশা-প্রত্যাশা কম রাখা।
৩. রাত্রিজাগরণ সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস, মনীষীদের উক্তি ও ঘটনা পাঠ করে রাত্রিজাগরণের ফজিলত আত্মস্থ করা।
৪. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, নামাযে স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গেই নিভৃতে আলাপচারিতা হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার ইবাদতের জন্য রাত্রিজাগরণের তৃষ্ণা ও তৃপ্তি দান করুন। আমীন।

আমার অভিলাষ

এই রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান। সুতরাং আমি—

- রমযানের প্রতিটি রাতে জেগে থাকতে সচেষ্ট হব।
- রাত কাটাব তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও কোরআন তেলাওয়াতে।
- রমযানের রজনীতে অবগাহন করব কালামে ইলাহীর সৌন্দর্যে।
- ইনশাআল্লাহ, পৃথিবীতে নয়, আমি বিশ্রাম করব কবরে ও জান্নাতে!
- আত্মরক্ষা করব গোনাহ হতে, পা দেব না নফস ও শয়তানের ফাঁদে।
- বঞ্চিত হব না রাত্রিজাগরণের অপার ফজিলত ও কল্পনাতীত কল্যাণ হতে।

(অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত। সূত্র : আবু হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/৩৫৬-৩৫৭)

জীবনের শেষ রমযানে
আমার কোরআন তেলাওয়াত

যদি আমি বিশ্বাস করে থাকি যে, আগত রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমি এ রমযানে তেলাওয়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেব এবং একাধিক বার কোরআন খতম করব। তবে আমার এবারের খতম হবে পূর্বের সকল খতম হতে ভিন্নধর্মী! আমার এবারের তেলাওয়াত হবে বিনম্র ও প্রকম্পিত চিত্তে, তাদাব্বুর ও ভাবনার সঙ্গে। প্রতিটি আয়াত পাঠ করার পর আমি কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নেব, হৃদয় ও বিবেক দিয়ে চিন্তা করব। উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব—আমার রব আমাকে কী বলেছেন, কী এই আয়াতের দাবি ও মর্মার্থ। আমি এতটুকু বিরতি নেব, যেন আয়াতটির গঠন-সৌন্দর্য ও মর্ম-শোভা আমার হৃদয়কে জয় করে নেয় আর আমার বিবেক ও হৃদয়জগৎ আয়াতের মর্ম ও দাবি, হিদায়াত ও নির্দেশনায় সিক্ত হয়।

আমি কোরআন পাঠ করব কাল কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর কাছ থেকে আজরে আযীম লাভের আশায়। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«يُقَالُ - يَعْنِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ- : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا»

(কিয়ামতের দিন) সাহিবে কোরআনকে বলা হবে, পড়, আর আরোহণ কর! দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করতে, সেভাবে পাঠ কর। যে আয়াতে তোমার পাঠ শেষ হবে, সেখানেই হবে তোমার মনযিল![৭০]

---

৭০ *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২৯১৪, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৪৬৪ ও *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ৬৭৯৯।

আমি চেষ্টা করব মসজিদ-মাদরাসায়, দ্বীনী মাহফিলে কোরআনের মজলিসে উপস্থিত থাকতে; কোরআন তেলাওয়াত, কোরআনের মর্ম ও বিধি-বিধান শিক্ষার উদ্দেশ্যে সমবেত হতে। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَه بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَه»

যখন একদল মানুষ আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর তার পর্যালোচনায় নিমগ্ন থাকে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমত (-এর শামিয়ানা) তাদের আচ্ছাদিত করে রাখে এবং ফিরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখে। আর আল্লাহ তাআলা তার নিকটভাজনদের (অর্থাৎ ফিরেশতাদের) মাঝে তাদের আলোচনা করেন।[৭১]

আমি কোরআন তেলাওয়াত করব এবং কোরআনের মাঝে বিচরণ করব। কল্পনা করব, আল্লাহ পাক যেন এই আমাকেই সম্বোধন করে বলছেন। একেকটি আয়াত তখন আমার অন্তরজগতে বিভিন্নমুখী প্রভাব ও বিচিত্র অনুভূতি সৃষ্টি করবে। কখনো আমার হৃদয়ে তৈরি হবে ব্যথা ও যন্ত্রণা, কখনো ভয় ও প্রকম্পন এবং কখনো আশা ও প্রত্যাশা। আমি কোরআন তেলাওয়াত করব এবং কাঁদব, যেভাবে কাঁদতেন সাহাবী ইকরিমা রাযি.। তিনি কোরআন খুলে চক্ষুযুগলের উপর রাখতেন, কাঁদতেন আর বলতেন, এ তো আমার রবের কালাম! আমার প্রতিপালকের বাণী![৭২]

আমি প্রতিটি আয়াত নিয়ে চিন্তা করব এবং অনুভব করব যে, গুরুভারবিশিষ্ট আয়াতটি আমার উপর আপতিত হচ্ছে; যেমন অনুভব করতেন উম্মাহর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ হযরত ওমর রাযি.। হযরত ওমর

---

[৭১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৬৯৯।
[৭২] আলখতীব আলবাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১০/৩২০।

রাযি. একদিন সূরা তাকভীর পাঠ শুরু করলেন এবং শুরু থেকে পড়তে পড়তে এই আয়াতে পৌঁছলেন—

﴿وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾

এবং যখন আমলনামা খুলে দেওয়া হবে। [সূরা তাকভীর : ১০]

এ আয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।[৭৩]

আরেকদিন তিনি জনৈক ব্যক্তির ঘরের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। ঘরের ভেতর লোকটি নামায পড়ছিল এবং নামাযে সূরা তূর তেলাওয়াত করছিল। তিনি সেখানে থেমে তার তেলাওয়াত শুনতে লাগলেন। নামাযী ব্যক্তিটি যখন এ আয়াতে পৌঁছল—

﴿اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ﴾

আপনার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যম্ভাবী। তা রোধ করতে পারে, এমন কেউ নেই। [সূরা তূর : ০৭-০৮]

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার সাওয়ারী (গাধা) থেকে নেমে পড়লেন এবং বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। এভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে এলেন। এরপর মাসাধিক কাল তিনি অসুস্থ ছিলেন। মানুষ তাকে দেখতে আসত; কিন্তু কেউ বুঝত না, তার অসুখটা কী?![৭৪]

জীবনের শেষ রমযানে আমার তেলাওয়াতের পরিমাণ কম হোক, আমি প্রতিটি আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবনে জোর দেব। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, 'আমি কোন একটি সূরার তেলাওয়াত শুরু করি, এরপর তাতে এমন কিছু মর্ম উপলব্ধি করি যে, ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি, সূরা আর শেষ হয় না।'

---

[৭৩] আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ৪/১৮৪।
[৭৪] ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৭/৪৩০, সুয়ূতি, *আদদুররুল মানছূর*, ৭/৬৩১ ও আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ৪/১৮৪।

আরেক অন্তর্জ্ঞানী বলেছেন, 'আমি যেসব আয়াতের দাবি ও মর্ম-দাবি উপলব্ধি করতে পারি না এবং যেসব আয়াত আমার অন্তরে রেখাপাত করে না, সেগুলো তেলাওয়াতে আমার সাওয়াব হবে বলে আমি মনে করি না।'

আবু সুলাইমান দারানী রহ. বলেন, 'আমি একটি আয়াত তেলাওয়াত করি এবং চার-পাঁচ রাত তাতেই অতিবাহিত হয়ে যায়। সে আয়াত থেকে আমার চিন্তাশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে আমি সামনে অগ্রসর হতে পারি না।'

জনৈক বুযুর্গ সূরা হূদের মাঝেই ছয় মাস কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বারবার তিনি এ সূরা তেলাওয়াত করতেন; কিন্তু এর মর্ম-উপলব্ধি শেষ করতে পারতেন না।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, 'আমার প্রতি সপ্তাহে এক খতম আছে, প্রতি মাসে এক খতম আছে, প্রতি বছরেও আছে এক খতম। আমার আরেকটি খতম চলছে ত্রিশ বছর ধরে, যা আমি এখনও শেষ করতে পারিনি। খতমের সময়ের এই ভিন্নতা চিন্তা-ভাবনা ও মর্ম অনুধাবনের স্তর অনুযায়ী হয়েছে। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান যত বেশি হয়, খতমের সময় মেয়াদ ততই দীর্ঘ হয়ে যায়।'[৭৫]

---

[৭৫] আবু তালিব আলমাক্কী, *কূতুল কুলূব ফী মুআ'মালাতিল মাহবূব* ... ও আবু হামিদ গাযালী, *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১/২৮২।

আমার কর্মসূচি

আমি বিশ্বাস করি যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান। আমার জীবনের এই শেষ রমযানে আমি—

- একাধিক বার কোরআন খতম করব।
- তেলাওয়াত করব বিনম্র-প্রকম্পিত চিত্তে।
- তেলাওয়াত করব তাদাব্বুর ও ফিকিরের সঙ্গে।
- বিচরণ করব কোরআনের শব্দ ও মর্মের সৌন্দর্যে।
- তেলাওয়াত করব আজরে আযীম লাভের প্রত্যাশায়।
- বারবার তেলাওয়াত করব এবং প্রতিবার কান্নায় সিক্ত হব।
- তেলাওয়াত করব এবং ভাবব, আমাকেই সম্বোধন করা হচ্ছে।

জীবনের শেষ রমযানে
আমার দান-সদকা

আমি যদি এ উপলব্ধি অর্জন করতে পারি যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমি আমার নিজের জন্য বা আমার ওয়ারিসদের জন্য আমার সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখব না। বরং আমি আমার সম্পদ এমন ক্ষেত্রে ব্যয় করব, যা আমার ভবিষ্যতে কাজে আসবে, আমার রবের কাছে সঞ্চিত থাকবে। আমি আমার সর্বস্ব ব্যয় করে খুঁজব কোন অসহায় ব্যক্তিকে, দরিদ্র দ্বীন-শিক্ষার্থীকে, নিষ্কলুষ জীবনযাপনে আগ্রহী অভাবগ্রস্ত কোন যুবককে, কিংবা সঙ্কটাপন্ন কোন মুসলমানকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি (পৃথিবীতে) কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।[৭৬]

আমি যদি আমার সম্পদ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাহলে হোক তা অতি অল্প, আমার এ সম্পদটুকুই বাকি থাকবে; সঞ্চিত থাকবে আগামীকালের জন্য! আর যা আমি পুঞ্জীভূত করে রাখব, তা-ই হবে ধ্বংস-নিঃশেষ!

---

[৭৬] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৪৪২ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৮০।

আম্মাজান হযরত হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, সাহাবীরা একদিন একটি বকরী যবেহ করেছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'বকরীটির কী অবশিষ্ট আছে?' হযরত আয়েশা রাযি. উত্তর দিলেন, 'কাঁধের অংশ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই' (সবকিছুই দান করে দেওয়া হয়েছে)। নবীজী এবার বললেন, 'কাঁধের অংশ ছাড়া আর সবকিছুই অবশিষ্ট আছে'! (অর্থাৎ বান্দা আল্লাহর রাস্তায় যা দান করে, তাই বান্দার জন্য বাকি থাকে)।[৭৭]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, এমনিতেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বদান্য। কিন্তু রমযান মাসে জিবরাঈল আ. যখন নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তার বদান্যতা আরও বৃদ্ধি পেত। রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল আ. তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারা একে অপরকে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবহমান বাতাসের চেয়েও অধিক বদান্য ছিলেন।[৭৮]

অধিকন্তু যদি এ রমযানই হয়ে থাকে আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমি কতটুকু সম্পদ দান করলাম, কত রইল, এসব চিন্তা ও হিসাব করব না। আমি এ হিসাব করব না যে, আমার সম্পদ হ্রাস পেল কি না? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইরশাদ করেছেন,

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»

দান-সদকায় সম্পদ হ্রাস পায় না।[৭৯]

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন,

«لَا تُوكِيْ فَيُوكَى عَلَيْكِ، لَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ»

---

[৭৭] *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২৪৭০।

[৭৮] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ০৬ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৩০৮।

[৭৯] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৮৮।

(সম্পদ কমে যাওয়ার আশঙ্কায়) দান বন্ধ রাখবে না; অন্যথায় তোমার প্রতি আল্লাহর দানও বন্ধ হয়ে যাবে। আর দান করতে গণনা কর না; অন্যথায় আল্লাহও তোমাকে হিসাব করে সীমিত দান করবেন।[৮০]

আমি এ বিষয়টিও লক্ষ রাখব যে, আমার দান যেন হয় আমার প্রিয় ও শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হতে। আল্লাহ যেমন ইরশাদ করেছেন,

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾

তোমরা কিছুতেই পুণ্যের নাগাল পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে (আল্লাহর জন্য) ব্যয় করবে। তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

[সূরা আলে-ইমরান : ৯২]

সুতরাং আমি যে ধরনের খাবার পছন্দ করি, গরীব-দুঃখীকে তেমন খাবারই দান করব। আমি যেমন পোশাক পরিধান করি, তাদেরকে ও তাদের সন্তানদেরকে তেমন পোশাকই প্রদান করব।

আমি সর্বদা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হব যে, আমি তো সাড়া দিচ্ছি আল্লাহর আহ্বানে, যিনি আমার কাছে 'ঋণ' দাবি করেছেন! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً﴾

এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার কল্যাণে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। [সূরা বাকারা : ২৪৫]

হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, যখন এই [উপরিউক্ত] আয়াতদু'টি অবতীর্ণ হলো, তখন আবু তালহা নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! অমুক অমুক স্থানে আমার বাগান আছে। আমি

---

[৮০] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৪৩৩ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১০২৯।

তা দান করে দিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি যদি এ কথা গোপনে বলতে পারতাম, তাহলে (এভাবে) প্রকাশ্যে বলতাম না।' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'তা তোমার দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দাও।'[৮১]

আমি আরও চেষ্টা করব আমরা দান-সদকা যেন হয় গোপনে, অন্যের অগোচরে। হ্যাঁ, যাকাত আমি প্রকাশ্যে আদায় করব। কেননা, তা ফরয ইবাদত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, সেও ভালো; আর যদি তা গোপনে অভাবীদের দান কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে কতই না শ্রেয়! এবং আল্লাহ তোমাদের মন্দকর্মসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।
[সূরা বাকারা : ২৭১]

আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه .... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُه ...»

যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাআলা (আরশের) ছায়া দান করবেন। ... এবং ওই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাতও জানে না যে, ডান হাত কী দান করেছে।[৮২]

---

[৮১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯৯৮ ও *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১২১৪৪।
[৮২] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৬০ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১০৩১।

আর রমযানের শেষ দিকে আমি আদায় করব সদকাতুল ফিতর। সদকাতুল ফিতর আদায় করা আমার প্রিয় নবীর নির্দেশ। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. বলেন, স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক-অপ্রাপ্তবয়স্ক নির্বিশেষে সকল মুসলমানের ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব, এক সা'[৮৩] পরিমাণ আদায় করা আবশ্যক করেছেন এবং লোকজনের ঈদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৪]

---

[৮৩] বর্তমানে প্রচলিত পরিমাপ হিসেবে এক সা' এর ওজন ৩.২৫৬ কিলোগ্রাম। সদকাতুল ফিতর সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে মোট পাঁচ ধরনের খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। তার মধ্য হতে খেজুর, যব, কিশমিশ বা পনিরের হিসাবে সদকা আদায় করতে চাইলে এক সা' বা ৩.২৫৬ কিলোগ্রাম খাদ্য বা তার মূল্য আদায় করতে হবে; আর গমের হিসেবে সদকা আদায় করতে চাইলে আধা সা' বা ১.৬২৮ কিলোগ্রাম গম বা তার মূল্য আদায় করতে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখা যেতে পারে, মাসিক আলকাউসার, সেপ্টেম্বর ২০০৮। (অনুবাদক)

[৮৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৫০৩ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯৮৬।

আমার সংকল্প

আমার বিশ্বাস, জীবনের শেষ রমযান আমার দোরগোড়ায়। তাই আগামী রমযানে আমি—

- অসহায়-অভাবীকে সহায়তা করব।
- আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর কাছে সঞ্চয় করব।
- নবীজীর ন্যায় মাহে রমযানে বদান্যতার হাত প্রসারিত করব।
- নিজের সবচেয়ে প্রিয় ও দামি সম্পদ হতে প্রফুল্ল চিত্তে দান করব।
- দান করব অতি গোপনে-সঙ্গোপনে; বাম হাতও যেন টের না পায়!
- আর সবশেষে রমযানের শেষ সময়ে আদায় করব 'সদকাতুল ফিতর'।

জীবনের শেষ রমযানে
আমার আত্মীয়তা-সম্পর্কের দাবি রক্ষা

আমি যদি বিশ্বাস করে থাকি যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে অবশ্যই আমি আমার আত্মীয়স্বজনের প্রতি আমার হক ও দায়িত্ব আদায় করব। আমি প্রত্যেক আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষায় সচেষ্ট হব। প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ করব, প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এক্ষেত্রে কেবল ফোনে যোগাযোগ করাকেই যথেষ্ট মনে করব না।

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ»

> রিহম (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আল্লাহর আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। সে বলে, যে ব্যক্তি আমার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।[৮৫]

আমি যেহেতু চাই যে, আল্লাহ আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ-আচরণ করবেন, সুতরাং হাদীসের দাবি অনুযায়ী আমি আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখব এবং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করব।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যারা অসুস্থ, আমি তাদের খোঁজ-খবর নেব এবং তাদের শুশ্রূষা করব। আমার নবীজী তো বলেছেন, আল্লাহ অসুস্থদের সঙ্গে আছেন! হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

[৮৫] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৫৫।

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ، فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ : يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُوْدُكَ؛ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ، فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ»

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম; কিন্তু তুমি আমার খোঁজ-খবর নাওনি।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কী করে আপনার খোঁজ-খবর নেব, আপনি যে জগৎসমূহের প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল?! তুমি তো তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে তার কাছে আমাকে পেতে।'[৮৬]

স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়তার হক আদায়ে পূর্ণ যত্নবান ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে তার মায়ের জন্য ইসতেগফার করার এবং মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّيْ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ، وَاسْتَأْذَنْتُه أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِيْ»

আমি আমার রবের কাছে আমার মায়ের জন্য ইসতেগফার করার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। অতঃপর তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি, তখন অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৮৭]

আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কারা কারা অভাব-অনটনে জর্জরিত, আমি তাও খুঁজে বের করব এবং আমার সম্পদ দিয়ে তাদের সহায়তা করব।

---

[৮৬] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৬৯।
[৮৭] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৯৭৬।

হযরত সালমান বিন আমের আযযাব্বী রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»

মিসকিনকে সদকা করলে তা কেবল সদকাই, আর আত্মীয়কে দিলে তাতে রয়েছে (সাওয়াবের) দু'টি দিক– একটি সদকা, আরেকটি আত্মীয়তা রক্ষা।[৮৮]

আমার আত্মীয়তা রক্ষা ও আত্মীয়তার দাবি আদায়ে কারও আচরণ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যে আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে, আমি তার কাছেও যাব এবং সম্পর্ক বজায় রেখে চলব। যার হক আদায়ে আমার ত্রুটি হয়ে গেছে, আমি তার কাছে ওযরখাহী করব। এতে লাভ ও কল্যাণ আমারই হবে, আমি নিষ্কৃতি পাব আযাবে ইলাহী হতে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُه وَصَلَهَا»

বিনিময় প্রদানকারী (প্রকৃত) আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক আদায়কারী ওই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তা বজায় রাখে।[৮৯]

মাতা-পিতার জীবদ্দশায় যেমন আমি তাদের হক আদায়ে সচেষ্ট থেকেছি, তাদের অবর্তমানেও তাদের সম্পর্কের দাবি রক্ষা করব। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, মক্কার এক পথে তার সঙ্গে জনৈক বেদুইনের সাক্ষাৎ হলো। আবদুল্লাহ বিন ওমর তাকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন, তাতে তাকে তুলে নিলেন। এরপর

---

[৮৮] *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ৬৫৮, *সুনানে নাসায়ী*, হাদীস নং ২৫৮২, *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদীস নং ১৮৪৪ ও *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১৬২২৭।

[৮৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৫৯৯১।

তিনি তার মাথার পাগড়িও তাকে প্রদান করলেন। তাবেয়ী আবদুল্লাহ বিন দীনার রহ. বলেন, আমরা তখন তাকে বললাম, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! বেদুইনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়' (এত সমাদরের কী প্রয়োজন ছিল?)। আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. উত্তর দিলেন, এই ব্যক্তির পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব (আমার পিতা)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ»

> কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে সদাচরণের সম্পর্ক রক্ষা করা।[৯০]

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যে কোন মূল্যে আত্মীয়তার হক আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। সু'দা বিন আওফ আলমারিয়া রাযি. বলেন, (আমার স্বামী) তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ রাযি. একদিন বিষণ্ন মনে আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তাকে বললাম, 'আপনার কী হয়েছে? আপনি কি আপনার পরিবার সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা দ্বিধায় ভুগছেন? আমাকে খুলে বলুন। আমি আপনাকে সন্দেহমুক্ত ও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! এমন কিছু নয়। তুমি তো মুসলিম পুরুষের জন্য বড় উত্তম সহধর্মিণী! বাস্তবতা হলো, আমার কিছু সম্পদ আমাকে চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে।' আমি তাকে বললাম, 'চিন্তার কী আছে?! আপনার ওপর তো আপনার আত্মীয়স্বজনের হক আছে।' (এ সম্পদ তাদের পেছনে ব্যয় করুন)। তখন তালহা তার জনৈক ক্রীতদাসকে ডেকে বললেন, 'আমার আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আন।' এরপর তিনি তার সম্পদ তাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। আমি বণ্টনকারীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কত প্রদান করলেন?' সে জানাল, 'চার লক্ষ (দিরহাম)!'[৯১]

আরেকবার তার কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে আত্মীয়তার দাবিতে কিছু প্রার্থনা করল। তিনি বললেন, 'আজকের পূর্বে আমার কাছে আত্মীয়তার দাবিতে

---

[৯০] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৫২।

[৯১] ইবনে আসাকির, *তারীখে দিমাশ্‌ক*, ২৫/১০০-১০১।

কখনো কিছু চাওয়া হয়নি। আমি খেয়ার (বিক্রিত পণ্য বিক্রেতার ফেরত গ্রহণের অধিকার)-সহ আমার একটি বাগান সাত লক্ষ দিরহামে বিক্রি করেছি। তুমি যদি চাও, আমি ক্রেতার কাছ থেকে (খেয়ারের অধিকারবলে) তা ফিরিয়ে নিয়ে তোমাকে দিয়ে দেব; আর যদি চাও, তাহলে বাগানটির মূল্য তোমাকে দিয়ে দেব।'[৬২]

[৬২] ইবনে আসাকির, *তারীখে দিমাশ্‌ক*, ২৫/১০০।

আমার শপথ

আর ক'দিন পরই আমার জীবনের শেষ রমযান। রমযানের পর আমি থাকব না, থাকবে না আত্মীয় ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক। তাই এ রমযানে আমি—

- সকল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখব।
- তাদের মধ্যে যারা পীড়িত, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করব।
- আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত, তাদের পাশে দাঁড়াব।
- আমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদকারীর সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে সচেষ্ট হব।
- মাতা-পিতার বন্ধুজনদের সঙ্গেও হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক বজায় রাখব।

জীবনের শেষ রমযানে আমার ইতেকাফ

আমি যদি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে থাকি যে, আগামী রমযানই আমার যিন্দেগীর আখেরী রমযান হতে যাচ্ছে, তাহলে আমি সচেষ্ট হব রমযানের শেষ বিশটি দিন বা ন্যূনতম শেষ দশ দিন মসজিদে ইতিকাফ করতে। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সব সময়) রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।[৯৩]

কিন্তু ইন্তেকালের বছর রমযান মাসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বিশ দিন ইতেকাফ করেন। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে দশ দিন ইতেকাফ করতেন। যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর ইতেকাফ করেন বিশ দিন।[৯৪]

আমার পরিবারের মহিলা সদস্যগণ যদি ইতেকাফ করতে চায় আর পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও থাকে, তাহলে তাদেরকেও ইতেকাফের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করব না। আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত এক হাদীসে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযানে ইতেকাফ করতেন। ফজরের নামায শেষে তিনি ইতেকাফের নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতেন। আয়েশা তার কাছে ইতেকাফ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা মসজিদে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু করে নিলেন। হাফসা তা শুনে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন এবং যায়নাবও তা শুনে (নিজের জন্য) একটি তাঁবু তৈরি করে নিলেন ... ।[৯৫]

---

[৯৩] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২০২৫ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৭১।
[৯৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২০৪৪।
[৯৫] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২০৪১ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৭২।

আমি রমযানের শেষ দশকে পূর্বের দিনগুলোর তুলনায় আরও বেশি ইবাদত করতে সচেষ্ট হব। হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইবাদতে এত বেশি পরিমাণ সচেষ্ট থাকতেন, যা অন্য সময়ে থাকতেন না।[৯৬]

নেক আমলের মাধ্যমে শেষ দশকের বরকত লাভে আমি আমার পরিবারকেও আহ্বান জানাব, তাদেরকেও সর্বোচ্চ ইবাদতে সচেষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করব। হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, রমযানের শেষ দশক এলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে থাকতেন। তিনি পরিবারের সদস্যদেরকেও জাগিয়ে দিতেন এবং ইবাদতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন।[৯৭]

ইতেকাফ করা অবস্থায় আমি ইতেকাফের যাবতীয় আদাব রক্ষা করে চলব। পার্থিব চিন্তা, সম্পদের মোহ সব পেছনে ফেলে নিমগ্ন থাকব একমাত্র আল্লাহর যিকির, কোরআনী ফিকির এবং আল্লাহর কুদরত ও নেয়ামত নিয়ে চিন্তা-ভাবনায়।

আমি ইতেকাফকারী অন্যান্য ভাইদের আরামের প্রতিও লক্ষ রাখব। সচেষ্ট থাকব তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে, বিরত থাকব তাদের কষ্টের কারণ হওয়া থেকে।

---

[৯৬] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৭৫।

[৯৭] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২০২৪ ও *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৭৪।

আমার অঙ্গীকার

আগামী রমযানই আমার যিন্দেগীর আখেরী রমযান। সুতরাং রমযানে আমি—

- শেষ বিশদিন, ন্যূনতম দশদিন মসজিদে ইতিকাফ করব।
- পরিবারের নারীদেরকে বাড়িতে ইতিকাফ করতে উদ্বুদ্ধ করব।
- রমযানের শেষ দশকে দিবস-রজনীর সর্বোচ্চ সময় ইবাদতে কাটাব।
- সারা রাত জেগে থেকে ইবাদতের মাধ্যমে শবে কদর লাভে সচেষ্ট হব।
- ইতেকাফকারী ভাইদের খেদমত করব, তাদের আরামের প্রতি লক্ষ রাখব।

জীবনের শেষ রমযানে
আমার তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা

যদি আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমি কিছুতেই এ রমযানে কোন গোনাহ করার দুঃসাহস করব না। আমি পত্রিকা-ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাব না, খুঁজব না নাটক-সিনেমা, বিনোদন-প্রোগ্রামের সংবাদ। আমার জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত তো অতি সীমিত ও সুনির্ধারিত! তিলে তিলে আমি যা নির্মাণ করেছি, থরে থরে আমি যা সাজিয়েছি; হেলায় তা ধ্বংস ও বিনষ্ট করে ফেলা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?! রমযান মাসে আমি রোযা, তারাবীহ, রাত্রি-জাগরণ, তেলাওয়াত ও দান-সদকার মাধ্যমে নিজের জন্য আজর ও সাওয়াবের এক সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছি। এক পলকের অবৈধ দৃষ্টি, একটা অন্যায় উচ্চারণ বা সামান্য অশ্লীল হাসি-তামাশার মাধ্যমে আমি কীভাবে নিজ-হাতে-গড়া এ প্রাসাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারি?!

জীবনের এই শেষ রমযানে আমি তো কিছুতেই মেনে নেব না মহা মূল্যবান একটি মুহূর্তেরও অপচয় কিংবা প্রয়োজন-অতিরিক্ত সামান্য নিদ্রাকেও; তাহলে কী করে মেনে নেব গোনাহে-অন্যায় কর্মে সময় কাটানোকে! এ তো মোটেও যৌক্তিক নয়।

জীবনের এই শেষ রমযানে আমি অগ্রসর হব না টেলিভিশন (ও মাল্টিমিডিয়া মোবাইলের) দিকে, সময় কাটাব না বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, আড্ডায়। এককথায়, আমি এমন কোন কাজে লিপ্ত হব না, যা আমাকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও বিরত রাখবে আল্লাহর ইবাদত হতে; হোক সে কাজ নির্দোষ, হোক তা আপাতদৃষ্টিতে মুবাহ ও বৈধ।

এই রমযানে আমি গোনাহ করি বা না করি, অবশ্যই আমি আমার পেছনের জীবনের যাবতীয় গোনাহর জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করব। মাসুম নবীও তো সর্বদা তাওবা-ইসতেগফার করতেন।

নবীজী বলেছেন,

«وَاللهِ! إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً»

আল্লাহর শপথ! আমি তো আল্লাহর নিকট দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি তাওবা-ইসতেগফার করি।[৯৮]

নবীজী সব সময়ই ইসতেগফার করতেন, এমনকি যখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বসে থাকতেন, তখনও করতেন তাওবা-ইসতেগফার। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. বর্ণনা করেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে অবস্থানকালে একই বৈঠকে নিম্নোক্ত ইসতেগফারটি এক শ বার পাঠ করতে গণনা করেছি—

«رَبِّ! اغْفِرْ لِيْ، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ»

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার তাওবা কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়াময়।[৯৯]

তবে আমার এ তাওবা হতে হবে নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ তাওবা, পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'তাওবাতুন নাসূহা' বা বিশুদ্ধ তাওবা। ইরশাদ হয়েছে—

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ﴾

হে ওই লোকেরা যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর নিকট তাওবা করো, বিশুদ্ধ তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক মোচন করে দেবেন তোমাদের গোনাহসমূহ, আর তোমাদের প্রবেশ

---

[৯৮] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬৩০৭।

[৯৯] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ১৫১৬, *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৪৩৪ ও *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৩৮১৪।

করাবেন এমন বাগ-বাগিচায়, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। [সূরা তাহরীম : ০৮]

অর্থাৎ আমার তাওবা হবে নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ, স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট এবং এই দৃঢ় অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ যে, ভবিষ্যতে আর কখনো পা বাড়াব না গোনাহের পঙ্কিল পথে।

আমার প্রতিশ্রুতি

জীবনের শেষ রমযান তো আমার দরজায় কড়া নাড়ছে! সারা জীবনের সকল গোনাহ হতে ক্ষমালাভের সর্বশেষ সুযোগ আমার সামনে! তাই এই রমযানে আমি—

- কোন গোনাহ করব না, অন্যায় পথে অগ্রসর হব না।
- অপ্রয়োজনীয় বৈধ কাজ হতেও যথাসম্ভব বিরত থাকব।
- পুরো রমযান মাসে বেশি বেশি তাওবা-ইসতেগফার করব।
- আমার তাওবা হবে নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ, খালিস ও বিশুদ্ধ।
- রমযানের ফজিলতপূর্ণ ইবাদতকে সামান্য অবহেলায় নষ্ট করব না।

জীবনের শেষ রমযানে
আমার উম্মাহ-দরদ, জাতি-চিন্তা

আমি তো এখন পূর্ণ বিশ্বাস করি যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান। সুতরাং আমার মন-মানসজুড়ে যেন জাগ্রত থাকে উম্মাহ-দরদ। মুসলিম উম্মাহ আজ ক্ষত-বিক্ষত, নির্যাতিত-নিপীড়িত এবং শতধা বিভক্ত! কত দুর্যোগ! কত সঙ্কট! উম্মাহর চিন্তায় আমি যদি অস্থির ও ব্যাকুল না হই, কাল কোন মুখে দাঁড়াব মহান আল্লাহর সামনে?! ফিলিস্তিন অবরুদ্ধ! ইরাক অধিকৃত! আফগানিস্তান জ্বলছে! চেচনিয়ায় চলছে নিপীড়ন! কাশ্মীরে অমানবিক নির্যাতন! সোমালিয়ায় ধ্বংসের উন্মাদনায় দমন-নিষ্পেষণ! সুদান ভেঙে দু' খান! (বার্মায় রাষ্ট্রীয় 'তত্ত্বাবধানে' মুসলিম নিধন আর সিরিয়ায় সভ্যতার 'নীরব' পতন!) এককথায় গোটা পৃথিবীজুড়ে নগ্ন পাশবিকতা! ইসলাম ও মানবতার বিরুদ্ধে কুফরি ও পশুত্বের হিংস্র উল্লাস!

আর আমরা?!

আমরা সেই জাতি!

নিরুত্তাপ! নিরুদ্বেগ! যেন কিছুই হয়নি!

কাল রবের সামনে দাঁড়িয়ে কী জবাব দেব?!

আমি তো নিমগ্ন ছিলাম খেলাধুলার সর্বশেষ সংবাদে?!

ব্যতিব্যস্ত ছিলাম শিল্প-সংস্কৃতি, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির খোঁজ-খবর নিতে?!

কিংবা আমি তো ব্যস্ত ছিলাম নিজেকে নিয়ে এবং আমার পরিবারকে নিয়ে?!

কাল কিয়ামতের দিন কাজে লাগবে এসব অজুহাত?!

হায়! কোথায় উম্মাহর প্রতি দরদ-জ্বালা?!

কোথায় এক জাতি-এক দেহ-এক প্রাণের অনুভূতি?!

পৃথিবীর পূর্বে-পশ্চিমে কোথাও মুসলিম জাতির আক্রান্ত হওয়ার সংবাদে আমিও কি দহন-যন্ত্রণা অনুভব করি? এক দেহের কোন অংশের অসুস্থতা কি ডেকে আনে পুরো দেহের উত্তাপ ও অনিদ্রা?![১০০]

আমি কি করে ভুলে গেলাম সেসব মুসলিম পুরুষের কথা, যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে; সেসব মুসলিম নারীর কথা, যাদের সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে; সেসব নিষ্পাপ শিশুদের কথা, যাদেরকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে! আমি কি করে ভুলে যাই—দেশে-দেশে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

কুরাইশ ও তাদের মিত্র গোত্র বনু বকর হুদাইবিয়া সন্ধি ভঙ্গ করার পর নবীজী যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন, তখন মাহে রমযান হওয়া সত্ত্বেও নিজে রোযা ভেঙেছেন, সাহাবায়ে কেরামকেও রোযা ভাঙার নির্দেশ দিয়েছেন।

রমযানের রোযা বিলম্বিত হতে পারে; কিন্তু আল্লাহর পথে অভিযানে বিলম্ব নেই!

এটি আমার-আপনার গবেষণালব্ধ উক্তি নয়; স্বয়ং নবীজীর দর্শন!

সুতরাং আমি যেন তাদের কথা বিস্মৃত না হই। আমি যেন ভুলে না যাই আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা।

---

১০০ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়ার্দ্রতা ও সহমর্মিতার দিক থেকে মুমিনদের দৃষ্টান্ত এক মানব-দেহের ন্যায়। যখন শরীরের কোন একটি অঙ্গ পীড়িত হয়ে পড়ে, তখন পুরো শরীরের নিদ্রা হারিয়ে যায় এবং জ্বর চলে আসে। [*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১১৭৪]

আমার ওয়াদা

জীবনের শেষ রমযান সমাগত-প্রায়। আমি তো মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য। উম্মাহর চিন্তা তো আমারই চিন্তা। সুতরাং এই রমযানে আমি—

- আমার উম্মাহকে ভুলব না।
- উম্মাহর দহন-যন্ত্রণায় অস্থির হব।
- এক দেহ-এক প্রাণের চেতনা লালন করব।
- উম্মাহর প্রতি নিজ দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখব।
- মুসলমানদের উন্নতির পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব।
- আরাকানী অসহায় মুহাজির ভাই-বোনদের স্মরণ রাখব।
- আরাকানী ভাইদের সাহরী-ইফতারের দস্তরখানে শরীক থাকব।
- মুহাজির শিশুদের মুখে ঈদ-আনন্দের হাসি ফোটাতে সচেষ্ট হব।

আমার পুরো জীবনই যেন হয় জীবনের শেষ রমযান!

প্রিয় পাঠক!

কেমন হওয়া উচিত আমার-আমাদের জীবনের শেষ রমযান, এতক্ষণ তাই পাঠ করলেন। বরং বলা ভালো, এমনটিই হওয়া উচিত আমার জীবনের বার মাস, আমার পুরো জীবন!

রমযানের পরও যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে পৃথিবীতে রাখেন, আমি কি পছন্দ করব যে, আমার প্রতিপালক শাওয়াল বা রজব মাসে আমাকে পাবেন হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত, অর্থহীন-তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজে ব্যস্ত?! কিয়ামতের দিন আমি কি আমার রবের সামনে দণ্ডায়মান হব এক মাসের প্রচেষ্টা আর এগারো মাসের উদাসীনতা সঙ্গে নিয়ে?!

নেক আমলের জন্য তো জীবনের কেবল একটি মাস নির্ধারিত নয়! পুরো জীবনটাই তো আনুগত্যের ও ইবাদতের! দেখুন, ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাযি. কত গভীর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ এক উপদেশ প্রদান করেছেন! তিনি যখন হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-কে শাম অভিযানে প্রেরণকালে বিদায় জানাচ্ছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন, 'আবু ওবায়দা! (সর্বদা) নেক আমল করবে, আল্লাহর পথে জিহাদ ও সংগ্রাম করে বাঁচবে আর শাহাদাতের মৃত্যু 'বরণ' করবে।[১০১]

আল্লাহু আকবার! কী গভীর মর্মসমৃদ্ধ নসীহত! কী প্রজ্ঞাপূর্ণ ওসিয়ত!

শুধু নেক আমলই যথেষ্ট নয়; অন্তরে লালন করতে হবে সার্বক্ষণিক সংগ্রামী চেতনা! হৃদয়ে জাগ্রত থাকতে হবে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের স্বপ্ন ও আগ্রহ! আল্লাহর রাহে জিহাদ ও সংগ্রাম! সংগ্রাম জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে! সংগ্রাম ইসলামের শত্রুদের বিপক্ষে রণাঙ্গনে, সংগ্রাম অত্যাচারী

---

[১০১] আবুর রবী' আলকিলায়ী', *আল-ইকতিফা বিমা তাযাম্মানাহু মিম মাগাযী রাসূলিল্লাহ ওয়াছ ছালাছাতিল খুলাফা*, ৩/১১৮।

শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণে, সংগ্রাম সংশয়বাদীদের বিরুদ্ধে কোরআন নিয়ে, সংগ্রাম উদাসীন ভাইদের দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে দাওয়াতের ময়দানে, সংগ্রাম প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম দ্বীনের পথে ও ইবাদতের পথে অটল থাকতে এবং সংগ্রাম গোনাহ ও অন্যায় থেকে আত্মরক্ষার্থে। জীবনটাই তো এক সংগ্রামমুখর অভিযাত্রা!

আমার পুরো জীবন এক সংগ্রামী জীবন! মুজাহিদের জীবন!

ক্ষণিকের সামান্য প্রচেষ্টা আর সংগ্রামমুখর কর্মজীবন কি কখনো এক হতে পারে?!

তারপর সংগ্রামমুখর জীবনও তো যথেষ্ট নয়!

আমরা তো খুঁজে ফিরব চির আরাধ্য শাহাদাতের মৃত্যু!

আমরা তো এখনও ঠিক করিনি জীবনের গতিপথ এবং মৃত্যুর সুনির্ধারিত পথ; তাহলে আমরা কি করে পাব কাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর দেখা?!

এই সূক্ষ্ম বিষয়ের বেশি বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। বরং এ বিষয়ে প্রিয় নবীজীর একটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»

> যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদের মর্যাদায় আসীন করবেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।[১০২]

প্রিয় পাঠক! নবীজীর যবান-নিঃসৃত 'আন্তরিকতার সঙ্গে' শব্দটি গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন। আল্লাহ তো আমাদের অন্তরের অবস্থা জানেন! জানেন আমাদের নিয়ত ও মনোবাসনার কথা!

আসুন, একটি আদর্শ রমযান কাটানোর পর আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করি—

'আমার পুরো জীবন হবে জীবনের শেষ রমযান'।

---

[১০২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৯।

শেষ কথা
ইবাদত করব নিষ্ঠার সঙ্গে

মুসলিম উম্মাহর হে প্রিয় সদস্য!

আপনি তো জানেন, সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা কান্না আর ভাড়াটে বিলাপকারীর কৃত্রিম কান্না কক্ষনো এক নয়!

সুতরাং জীবনের এই শেষ রমযানে আমরা যেন 'কৃত্রিম' ইবাদত না করি! ইবাদতের ভান না করি! আমরা তো জানি, দয়াময় আল্লাহর আনুগত্যই আমাদের জান্নাতের একমাত্র পথ। আমরা আরও জানি, কারও ইবাদতে-আনুগত্যে আল্লাহর কোন লাভ নেই, কারও গোনাহে-অবাধ্যতায় আল্লাহর নেই কোন ক্ষতি; আমাদের যাবতীয় আমল ও ইবাদতে লাভ ও কল্যাণ আমাদেরই।

সুতরাং সর্বশেষ নসীহত বলুন, কিংবা ওসিয়ত—আমল করুন এবং আমল করুন। সংগ্রামের জীবন গ্রহণ করুন; আরাধ্য মৃত্যুর সন্ধান করুন। সকল নেক আমল ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে করুন। সময় কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে! পার্থিব জীবনের যে সময়গুলো গত হয়ে গেছে, তার চেয়ে অনেক অনেক কম সময় বাকি আছে!

প্রিয় নবীজীর ইরশাদ মনে আছে?! নবীজী তো বলেছেন–

«اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَه، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ»

> বুদ্ধিমান হলো ওই ব্যক্তি, যে স্বীয় নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যুর পরের (অনন্ত জীবনের) জন্য আমল করে।[১০৩]

দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের দান করেন আদর্শ মুমিনের রমযান, ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে করেন সম্মানিত-মর্যাদাবান, এক দেহ-এক প্রাণ। আমীন।

---

[১০৩] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদীস নং ১৭১২৩, *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ২৪৫৯ ও *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং ৪২৬০।

আমার সর্বশেষ প্রতিজ্ঞা

- আমার প্রতিটি ইবাদত হবে ইখলাস ও ইহতিসাব-পূর্ণ।
- আমি ইবাদত করব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে সাওয়াবের আশায়।
- আমার জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটি মাস হবে যিন্দেগীর আখেরী রমযান!
- কারণ, আমি চক্ষুষ্মান! আমি বিবেকবান! পরিচয়ে আমরা 'মুসলমান'!

[সমাপ্ত]

চলে গেছে জীবনের কতগুলো রমযান!
পুষ্পিত বসন্তের সুবাসিত ফল্গুধারা নিয়ে!
রহমত-মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে!
দরজায় কড়া নাড়ছে আরেকটি 'মাহে রমযান'!
অসামান্য অর্জন ও অত্যুচ্চ প্রাপ্তির অপার সম্ভাবনা নিয়ে!

কিন্তু ....।
কীভাবে যেন কেটে যায় দিনগুলো!
হেলায়-ফেলায়- অবহেলায়-উদাসীনতায়!
মাস শেষে আফসোস! বার দু'য়েক দীর্ঘশ্বাস!
রমযান এল, রমযান গেল, এগার মাসের মতই!

অথচ ....।
এই রমযানই হয়তো জীবনের শেষ রমযান!
শেষ সুযোগ ক্ষমা লাভের! শেষ সুযোগ প্রাপ্তি ও অর্জনের!
গতবার কতজন ছিলেন! সাহরীতে-ইফতারীতে! জীবনের পরতে-পরতে!
আজ তারা নির্জন কবরে! রমযান শেষেই হয়তো আমার পালা, ডাক আসার!

তাহলে ....।
কীভাবে কাটাবেন আপনার জীবনের শেষ রমযান?!
কীভাবে কাজে লাগাবেন প্রতিটি ক্ষণ, সেকেন্ডের প্রতিটি ভগ্নাংশ?!
কীভাবে ভাবতে শিখবেন– 'এটাই আমার জীবনের সর্বশেষ রমযান'?!
তা জানতেই প্রিয় পাঠক আপনার জন্য **'এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান'**!